কোরআন, হাদীস ও বাইবেল অনুসারে

মাউন্ট কারমেলের ডাক

সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই



সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

মাউন্ট কারমেলের ডাক: সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই

(প্রাচীন কাহিনী থেকে আধুনিক জীবনের শিক্ষা)

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা **খন্দকার জেবন নেসা**

কপিরাইট নোটিশ

অনুমতির জন্য যোগাযোগ

এই বইয়ের কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, অনুলিপি বা ব্যবহার করতে চাইলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

সৈয়দ মাহবুব হাসান আমিরী
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
amiri@drmc.edu.bd

ন্যায্য ব্যবহারের নোটিশ (Fair Use Notice)

প্রস্তাবনা

আধুনিক হৃদয়ের জন্য এক প্রাচীন সতর্কবার্তা

আমার সামনে যখন 'বনাম বাল: এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য আত্মার বিনিময়' বইটির পাণ্ডুলিপি রাখা হলো, তখন আমি প্রথমে কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলাম। বাল? সেই তিন হাজার বছর আগের এক বিস্মৃত দেবতা? যে দেবতার নাম আজ শুধু প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণাপত্রে কিংবা ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের কোণঠাসা পৃষ্ঠায় ঠাঁই পায়, তাকে নিয় একটি পূর্ণাঙ্গ বই এবং তাও আবার আধুনিক জীবনের প্রাসঙ্গিকতায় এই উদ্যোগ সত্যিই অভিনব। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি পড়তে শুরু করার পর আমার বিস্ময় ক্রমশ প্রশংসায় এবং সবশেষে গভীর আত্মজিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

এই বইটি ইতিহাসের ধুলোমাখা পথ ধরে হাঁটে না। বরং এটি ইতিহাসের আয়নাকে বর্তমানের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। লেখক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন কানানের সেই কৃষক, যে এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় নিজের সন্তানকে মূর্তির আগুনে ফেলে দিত, আর একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষ, যে ক্যারিয়ারের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে নিজের ঈমান ও নৈতিকতাকে বিসর্জন দিচ্ছে তাদের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্যটা শুধু 'মূর্তি'র রূপে। তখন ছিল পাথরের বাল, আর আজ হলো ব্যাংক ব্যালেন্স, কর্পোরেট পদবী, সামাজিক স্বীকৃতির ফলোয়ার সংখ্যা। এটি একটি গভীর ও ভয়াবহ সত্য, যা আমরা প্রতিদিন অনুভব করি কিন্তু খুব কমই স্বীকার করি।

লেখক কোরআনের একটি রহস্যময় আয়াত থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন সূরা আস-সাফফাতের ১২৫ নম্বর আয়াত, যেখানে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর কণ্ঠে প্রশ্ন ছুঁড়েছেন: "তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?" এই প্রশ্নটি কেন মক্কার মুশরিকদের চেনা কোনো মূর্তি সম্পর্কে নয়? কেন আল্লাহ তাআলা হাজার মাইল দূরের আর হাজার বছর আগের এক অচেনা দেবতার নাম উচ্চারণ করলেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই লেখক উন্মোচন করেছেন এক চমকপ্রদ সত্য বাল কোনো নির্দিষ্ট মূর্তির নাম নয়, বরং তা হলো একটি চিরন্তন মানসিকতার নাম। এটি সেই মানসিকতা, যেখানে মানুষ তার রিজিক, নিরাপত্তা ও সম্মানের উৎস হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে দুনিয়ার কোনো মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

বইটির কাঠামো অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত। পাঁচটি পর্বের মাধ্যমে লেখক আমাদের নিয়ে গেছেন প্রাচীন কানানের ধুলোমাখা পথ থেকে কারমেল পর্বতের অগ্নিস্নাত চূড়ায়, তারপর ইতিহাসের গর্ভ থেকে বের করে এনে ফেলেছেন আধুনিক জীবনের কোলাহলের মাঝখানে। প্রথম পর্বে আমরা জানতে পারি, কিভাবে একটি কৃষিনির্ভর সমাজের বৃষ্টির অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নিয়েছিল বাল দেবতার ধারণা। দ্বিতীয় পর্বে আমরা দেখি, কিভাবে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ও ধর্মীয় গোঁড়ামির মিশ্রণে বালপূজা বনী ইসরাইলের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেছিল। তৃতীয় পর্বটি ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের ওপর এক অসাধারণ আলোকপাত তিশবীয় বজ্রের আবির্ভাব থেকে কারমেল পর্বতের মহাচ্যালেঞ্জ, আসমান থেকে আগুন নেমে আসা এবং রহমতের বৃষ্টির মাধ্যমে খরার অবসান। চতুর্থ পর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করি ইজেবেলের ভয়াবহ পরিণতি এবং ইলিয়াস (আ.)-এর বিদায়ের রহস্যময়তা। কিন্তু সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী ও চিন্তা-উদ্দীপক হলো পঞ্চম পর্ব 'সমসাময়িক বাল: আমরা কাকে সেজদা করছি?'

এই পঞ্চম পর্বটিই বইটিকে একটি নিছক ঐতিহাসিক গবেষণা থেকে উত্তীর্ণ করে এক জীবন্ত সতর্কবার্তায় পরিণত করেছে। লেখক এখানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে চিহ্নিত করেছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সেই সব 'বাল'কে, যাদের আমরা অজান্তেই সেজদা দিয়ে চলেছি। চাকরি ও কর্পোরেট দাসত্ব, ব্যাংক ব্যালেন্সের নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক স্বীকৃতির মরীচিকা, ডিগ্রি ও পদবির অহংকার এগুলোই আমাদের আধুনিক মূর্তি। আর সবচেয়ে মর্মান্তিক অধ্যায়টি হলো 'আধুনিক শিশুবলি'। লেখক প্রশ্ন তুলেছেন আমরা কি আমাদের সন্তানদের জ্বলন্ত আগুনের চুল্লিতে ফেলছি না? হয়তো দৈহিকভাবে নয়, কিন্তু তাদের ঈমান, নৈতিকতা ও আখেরাতকে আমরা কি ক্যারিয়ারের প্রতিযোগিতার আগুনে পুড়িয়ে ছাই করছি না? একজন পিতা হিসেবে এই প্রশ্নগুলো আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে।

বইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সাবলীল ভাষা। লেখক পবিত্র কোরআনের আয়াত, তাফসীরে ইবনে কাসির ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি, বাইবেলের ঐতিহাসিক বর্ণনা, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ এবং আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার এক অসাধারণ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে সংযোজিত 'আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন' অংশটি বইটিকে শুধু একটি পঠনীয় গ্রন্থ নয়, বরং একটি আত্মশুদ্ধির ব্যবহারিক কর্মপুস্তকে পরিণত করেছে।

পরিশিষ্টগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন। বাল দেবতার বিভিন্ন রূপ, কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ, প্রাচীন ও আধুনিক বালপূজার সাদৃশ্য, ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জি এবং তাওয়াক্কুলের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এসব সারণী ও তার বর্ণনা পাঠককে একটি সুসংহত ধারণা প্রদান করে এবং ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে।

আমি বিশ্বাস করি, এই বইটি শুধু ইসলামী ইতিহাস বা ধর্মতত্ত্বের শিক্ষার্থীদের জন্যই নয়; বরং প্রতিটি চিন্তাশীল মুসলিমের জন্য এক অপরিহার্য পাঠ। যে যুবক ক্যারিয়ারের উত্থান-পতনে দিশেহারা, যে পিতা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, যে ব্যবসায়ী হালাল-হারামের দ্বন্দ্বে জর্জরিত, যে গৃহিণী পারিবারিক ও সামাজিক চাপে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না সকলেই এই বইয়ে নিজেদের জন্য একটি দর্পণ এবং একটি পথের দিশা পাবেন।

ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতে দাঁড়িয়ে যে প্রশ্নটি করেছিলেন "তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে?" সেই প্রশ্নটি আজ আমাদের প্রত্যেকের সামনে। আমরা কি আল্লাহর ওপর ভরসা রাখব, নাকি দুনিয়ার মূর্তিগুলোর পায়ে মাথা নত করব? এই বইটি আমাদের সেই সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

লেখকের প্রতি আমার আন্তরিক দুআ রইল। আল্লাহ তাআলা এই বইটিকে পাঠকের অন্তর পরিবর্তনের একটি মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। এবং হে আল্লাহ, আমাদের সকলের অন্তরকে তুমি সত্যের ওপর অবিচল রাখো এবং সমস্ত 'বাল' থেকে আমাদের রক্ষা করো। আমিন।

সৈয়দ মেহেদী হাসান আমিরী
প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও গবেষক
খতিব, টাটেরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ ও ঈদগাহ্
কুমিল্লা, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

ভূমিকা: যে গল্প আজকের জীবনের আয়না

আপনি যখন এই বইটি হাতে তুলে নিয়েছেন, তখন হয়তো আপনার মনেও একটা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। হাজারো ঘটনা, হাজারো নবীর কাহিনি আর অগণিত উপদেশে ভরা পবিত্র কোরআন। সেই কোরআনে আল্লাহ তাআলা কেন হঠাৎ করেই একটি অদ্ভুত নাম উচ্চারণ করলেন **"বাল"**? মক্কার কাফেররা যাদের পূজা করত, কাবার চারপাশে যাদের তিনশো ষাটটি মূর্তি সাজানো ছিল হুবাল, লাত, মানাত, উযযা তাদের কারোর নাম কোরআন এত জোরালোভাবে উচ্চারণ করেনি। অথচ চোখের সামনের সেই সব পরিচিত দেবতাদের বাদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে নিয়ে এলেন হাজার মাইল দূরের আর হাজার বছর আগের মৃত এক সভ্যতার এক বিস্মৃত দেবতার কাহিনি।

কেন?

এই প্রশ্নই আমাদের এই পুরো বইয়ের প্রাণ। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই আমরা আবিষ্কার করব যে, 'বাল' কোনো জড় পদার্থের নাম নয়। বাল হলো একটি ধারণা, একটি ভয়, একটি প্রবৃত্তির নাম যা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল এবং যা আজও আমাদের শোবার ঘরে, আমাদের অফিসের ডেস্কে আর আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পাতায় রাজত্ব করে চলেছে। আমরা হয়তো নিজেদের সভ্য ভাবি, আমরা হয়তো পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নত করি না, কিন্তু আমরা কি রিজিকের ভয়ে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তায় আর সামাজিক স্বীকৃতির দাসত্বে সেই একই পাপ করছি না, যে পাপ করেছিল প্রাচীন কানানের মানুষ?

এই ভূমিকা অংশে আমরা তিনটি মৌলিক জিনিস বোঝার চেষ্টা করব। প্রথমত, কোরআনে বালের উল্লেখের পেছনের সেই রহস্যময়তা ও প্রজ্ঞার দিকটি। দ্বিতীয়ত, শিরকের বাহ্যিক রূপ আর আমাদের অন্তর্নিহিত ভয়ের সেই গোপন সম্পর্কটি। এবং তৃতীয়ত, এই বই পড়ার মাধ্যমে আমরা আসলে কী খুঁজতে যাচ্ছি এবং এই যাত্রার একটি রূপরেখা।

প্রথম পাঠ: কোরআনে বালের উল্লেখ কেন এত রহস্যময়?

পবিত্র কোরআনের সূরা আস-সাফফাতের ১২৫ নম্বর আয়াতটি পাঠ করুন। আল্লাহ তাআলা বলছেন:

"أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ"

"তোমরা কি 'বাল'-কে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?"

আয়াতটি নাজিল হয়েছিল মক্কার কুরাইশদের প্রেক্ষাপটে। তারা বিশ্বাস করত আল্লাহ্ই সর্বোচ্চ স্রষ্টা, কিন্তু তারা বিভিন্ন মূর্তিকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী হিসেবে মানত। কিন্তু এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাদের বর্তমানের কোনো মূর্তির (যেমন লাত বা মানাত) নাম না নিয়ে, ইতিহাসের অতল গহ্বর থেকে 'বাল' নামক এক দেবতাকে টেনে তুললেন। কেন?

প্রথম কারণ: চিন্তার প্ররোচনা।

কোরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি পাঠককে চিন্তা করতে বাধ্য করে। মক্কার মুশরিকরা যদি তাদের পরিচিত কোনো দেবতার নাম শুনত, তবে তারা সেটিকে তাদের গোত্রীয় অহংকার বা প্রচলিত রীতি হিসেবে দেখত। কিন্তু "বাল" শব্দটি তাদের কাছে ছিল অপরিচিত। এই অপরিচিত নামটি তাদের থামতে বাধ্য করেছিল এবং ভাবতে বাধ্য করেছিল, "এই বাল কে? যার পূজা করার জন্য আল্লাহ আমাদের তিরস্কার করছেন?"

দ্বিতীয় কারণ: সার্বজনীন সত্য।

শিরক কখনোই কোনো নির্দিষ্ট কাল বা স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মক্কার মুশরিকদের মূর্তিগুলো যেমন আজ ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি আগামীকাল হয়তো অন্য কোনো নামে আরেক মূর্তি তৈরি হবে। কিন্তু 'বাল' হলো শিরকের আর্কিটাইপ বা মূল নমুনা। আল্লাহ যেন বলতে চাইছেন: "তোমাদের পূজার জিনিসগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু যে ভয় ও মূর্খতা থেকে তোমরা তাদের পূজা করছো, তার ইতিহাস 'বাল'-এর পূজার মতোই প্রাচীন ও জঘন্য।"

তৃতীয় কারণ: রিজিকের সাথে সম্পর্কিত ভয়ের অমরতা।

গবেষক ও মুফাসসিররা বলেন, আরবের অন্যান্য দেবতারা ছিল মূলত সুপারিশের জন্য, কিন্তু বাল ছিল সরাসরি **রিজিকের দেবতা**। মানুষ তাকে বৃষ্টি ও ফসলের মালিক মনে করত। কোরআন এখানে সরাসরি আঘাত করল মানুষের সেই সবচেয়ে মৌলিক দুর্বলতায়

ক্ষুধার ভয়, ভবিষ্যতের ভয়। কোরআন যেন যুগে যুগে মানুষের কাছে প্রশ্ন রেখে গেল: তোমরা কি সত্যিই মনে করো তোমাদের রুটি-রুজির মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ?

এ কারণেই বালের ঘটনা কোরআনের পাতায় রহস্যময় হয়ে আছে। এটি শুধু একটি ইতিহাসের কাহিনি নয়; এটি একটি **চিরন্তন সতর্কবার্তা**।

দ্বিতীয় পাঠ: শিরকের বাহ্যিক রূপ বনাম অন্তর্নিহিত ভয়

আমাদের সমাজে আমরা শিরক বলতে বুঝি মূর্তির সামনে মাথা নত করা কিংবা কবরে সেজদা দেওয়া। কিন্তু এই বইয়ের একটি প্রধান লক্ষ্য হলো আমাদের বোঝানো যে, শিরকের জন্ম হয় **অন্তরে**। বাহ্যিক মূর্তি তো কেবল সেই অন্তরের রোগের বহিঃপ্রকাশ।

মূর্তি কেন বানায় মানুষ?

মানুষ যখন কোনো জিনিসকে ভয় পায় অথবা ভালোবাসে আল্লাহর চেয়ে বেশি, তখনই সে সেই জিনিসের একটি মানসিক প্রতিমা তৈরি করে। প্রাচীন কানানের কৃষকের কথা ভাবুন। তার জীবন এক টুকরো মেঘের উপর নির্ভরশীল। আকাশে মেঘ না দেখলে তার সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার ক্ষমতা তার থাকে না। এই অসহায়ত্বের মুহূর্তে শয়তান ফিসফিস করে বলে, "একটা শক্তি আছে, যে এই বৃষ্টিকে আটকে রেখেছে। তাকে রাজি করাতে হবে।" আর এই ফিসফিসানি থেকেই জন্ম নেয় বাল নামক সেই পাথরের মূর্তি, যার সামনে মানুষ নিজের সন্তানের রক্ত পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়।

বাহ্যিক শিরক বনাম অন্তর্নিহিত শিরক (শিরকে খফি)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য যে জিনিসটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন, তা হলো **শিরকে খফি** বা গোপন শিরক। সাহাবায়ে কেরাম যখন জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, গোপন শিরক কী?" তিনি বললেন, "তা হলো রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা।"

কিন্তু আমরা যদি আরেকটু গভীরে যাই, তাহলে দেখব, গোপন শিরকের আরেকটি মারাত্মক রূপ হলো **রিজিকের ভয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর ভরসা করা**।

আপনি কি কখনো চাকরি হারানোর ভয়ে এমন কোনো কাজ করেছেন যা আপনার জানা মতে হারাম? আপনি কি কখনো ভেবেছেন, "আমি যদি সত্য কথাটা বলি, তাহলে আমার প্রমোশনটা আটকে যাবে, আমার সংসার চলবে না"? এই যে চিন্তা এটাই হলো আধুনিক বালপূজার সূত্রপাত। এখানে আপনি কোনো পাথরের সামনে দাঁড়ান নি বটে, কিন্তু আপনার অন্তর সেজদা করছে আপনার বসকে, আপনার ব্যবসায়িক পার্টনারকে, আপনার ব্যাংক ব্যালেন্সকে। আপনি বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, আপনার রিজিকের চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে নয়, বরং এই দুনিয়াবী মাধ্যমগুলোর হাতে।

ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা এখানেই।
ইলিয়াস আলাইহিস সালাম যখন রাজা আহাবের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আগামী বছরগুলোতে বৃষ্টি হবে না," তিনি আসলে সমগ্র জাতির সেই অন্তর্নিহিত ভয়ের অস্ত্রোপচার করছিলেন। তিনি তাদের দেখাতে চেয়েছিলেন, তোমরা যাকে ভয় পাও (খরা) এবং যার কাছে আশা করো (বৃষ্টি), তার কোনোটির মালিক বাল নয়। বরং সেই সত্তাই মালিক, যার কাছে ইলিয়াস দোয়া করছেন।

আমরা এই বইয়ে কী খুঁজতে যাচ্ছি? (পাঠ পরিকল্পনা ও গাইডলাইন)

এটি কোনো সাধারণ গল্পের বই নয়, কিংবা নিছক ইতিহাসগ্রন্থও নয়। এটি একটি আত্মজিজ্ঞাসামূলক সফর। এই বইটি আমরা চারটি ভিন্ন মাত্রায় সাজিয়েছি, এবং ভূমিকা হিসেবে আমি আপনাকে এই মাত্রাগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।

মাত্রা ১: ঐতিহাসিক অনুসন্ধান (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব)

আমরা ফিরে যাব আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত প্রাচীন কেনান দেশে। আমরা জানবো, কীভাবে একটি কৃষিনির্ভর সমাজ ধীরে ধীরে এক আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়ে আবহাওয়া ও উর্বরতার দেবতা বালের পূজায় লিপ্ত হলো। আমরা প্রত্নতাত্ত্বিক নথিপত্র, প্রাচীন শিলালিপি এবং বাইবেলের ঐতিহাসিক বর্ণনার আলোকে বালপূজার সেই নিষ্ঠুর অধ্যায়গুলো খুলে দেখব। এটা শুধু অতীতের গল্প নয়; এটা আমাদের বর্তমানের মানসিকতার একটি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য।

মাত্রা ২: ধর্মতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও তাফসীর (তৃতীয় পর্ব)

এই অংশে আমরা ডুব দেব কোরআন ও হাদিসের গভীরে। আমরা বুঝবো, ইলিয়াস (আ.)-এর মুজিজা (আগুন আসা, বৃষ্টি হওয়া) কেন ঘটেছিল। আমরা তাফসীরে ইবনে কাসির, তাফহীমুল কোরআন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানবো, কিভাবে আল্লাহ তাআলা মিথ্যাকে ধ্বংস করেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারমেল পাহাড়ের সেই চ্যালেঞ্জের প্রতিটি ধাপের তাৎপর্য আমরা বিশ্লেষণ করব।

মাত্রা ৩: সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ (চতুর্থ পর্ব)

এটি বইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী অংশ। এখানে আমরা প্রশ্ন তুলব: আধুনিক দুনিয়ায় আমাদের 'বাল' কে? কেন আমরা হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে শুধু রিজিকের ভয়ে দুনিয়ার পেছনে ছুটছি? আমরা দেখব, কর্পোরেট সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি, এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা কিভাবে আমাদের অন্তরে "রিজিকের ভয়" নামক সেই পুরনো রোগটিকে নতুন করে জাগিয়ে তুলছে।

মাত্রা ৪: আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (প্রতিটি অধ্যায়জুড়ে)

আপনি লক্ষ্য করবেন, বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আমরা কিছু প্রশ্ন রেখেছি। এগুলো 'রিডিং কম্প্রিহেনশন' নয়; এগুলো আপনার অন্তরের সাথে কথোপকথন। যেমন:

- আজকের দিনে আমার কোন কাজটি করার সময় আমি আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে বেশি খুশি করার চিন্তা করেছি?
- আমার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আমি যে পথ বেছে নিচ্ছি, তা কি ইলিয়াস (আ.)-এর মতো তাওয়াক্কুলের পথ, নাকি ইজেবেলের মতো অহংকারের পথ?

ভূমিকা থেকে মূল গ্রন্থে প্রবেশের আগে কিছু জরুরি কথা

প্রিয় পাঠক, এই বই পড়ার সময় আপনার মনে হতে পারে, "আমি তো অনেক ছোট, আমার দ্বারা কি এত বড় ত্যাগ সম্ভব?" অথবা "আমার চাকরি তো হারাম পন্থায় উপার্জিত নয়, কিন্তু আমার বস তো ঠিক মুসলিম মানসিকতার নন, আমি কীভাবে সবকিছু হালাল রাখব?"
এই অনুভূতিগুলোই প্রমাণ করে আপনার অন্তর জীবিত। ইলিয়াস (আ.)-এর গল্প শুধু একজন নবীর বিজয়গাথা নয়; এটি একজন **একাকী সত্যের পথিকের গল্প**। যখন চারদিকে বালের ৪৫০ জন পুরোহিত, তখন তিনি একা। যখন চারদিকে খরা আর মৃত্যু, তখন তিনি আল্লাহর ওয়াদায় অটল।

আমরা এই বইয়ে বারবার দেখাব যে, আল্লাহর পথে চলা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। ইলিয়াস (আ.) ভেজা কাঠে আগুন চাননি এই ভেবে যে, "আমি নিজে কিছু করব।" বরং তিনি কাঠ আরও বেশি ভিজিয়েছিলেন এই বিশ্বাসে যে, "আমার রব আসমান থেকে আগুন পাঠাবেন।"

এটাই তাওয়াক্কুল। এটাই ঈমান।

আমরা এই বইয়ে আপনার সামনে ইতিহাসের আয়না ধরে দেখাতে চাই আপনারই চেহারা। আমরা জানি, আপনি বালকে চেনেন না। কিন্তু এই বই শেষে আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার দৈনন্দিন জীবনের কোন কোন জায়গায় সেই বাল দেবতার ছায়া লুকিয়ে আছে। আর একবার চিনতে পারলে, কারমেল পাহাড়ের সেই আগুনের মতোই আপনি সেই ছায়াকে চিরতরে দূর করতে পারবেন।

আসুন, শুরু করা যাক সেই সফর। সময় যন্ত্রে চেপে আমরা ফিরে যাই তিন হাজার বছর আগের কেনান দেশে, যেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মানুষের বিবেক বিক্রি হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম পর্ব: অন্ধকারের পূর্বপুরুষ : বালের উত্থান

আমরা যখন পবিত্র কোরআনের পাতায় চোখ বুলাই, তখন সূরা আস-সাফফাতের ১২৫ নম্বর আয়াতটি যেন ইতিহাসের গভীর কোনো কুয়ো থেকে ভেসে আসা প্রতিধ্বনির মতো কানে বাজে। আল্লাহ তাআলা বলছেন: "أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" – "তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?" এই একটি মাত্র নাম 'বাল' যেন তিন হাজার বছরের ধুলো ঝেড়ে ফের জীবন্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই বাল কে? কেন তার নাম ইতিহাসের পাতায় রক্তাক্ত অক্ষরে লেখা? কেন তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর অন্যতম ভয়ঙ্কর এক ধর্মীয় অন্ধকার? এই প্রথম পর্বে আমরা সেই অন্ধকারের সূতিকাগারে প্রবেশ করব। আমরা হেঁটে বেড়াব প্রাচীন কানানের পাহাড়ি ঢালে, ভূমধ্যসাগরের নোনা হাওয়ায়। আমরা জানার চেষ্টা করব, কিভাবে এক টুকরো মেঘের আশায় মানুষ নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে গিয়ে পাথরের দাসত্ব বরণ করেছিল।

অধ্যায় ১: কানান দেশের মানচিত্র ও মনস্তত্ত্ব

ইতিহাস কখনো শূন্যে জন্ম নেয় না। প্রতিটি সভ্যতা, প্রতিটি ধর্মবিশ্বাস, প্রতিটি কুসংস্কারের পেছনে থাকে একটি ভূমি, একটি জলবায়ু এবং একটি অর্থনীতি। বাল দেবতার উত্থানকে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে পা রাখতে হবে সেই ভূখণ্ডে, যে ভূমি একাধারে দুধ-মধুর প্রবাহীভূমি হিসেবে পরিচিত এবং অন্যদিকে ধ্বংস ও ক্রোধের আগুনে পুড়ে যাওয়া এক জনপদ। এই ভূমির নাম কানান।

ভৌগোলিক অবস্থান: যেখানে তিন মহাদেশের শ্বাস মিলিত হয়

প্রাচীন কানান বলতে আমরা যে অঞ্চলকে চিহ্নিত করি, তা আজকের রাজনৈতিক মানচিত্রে লেবানন, সিরিয়ার পশ্চিম উপকূল, ফিলিস্তিন, ইসরায়েল এবং জর্ডানের কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। এটি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরবর্তী একটি সরু কিন্তু অত্যন্ত কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ ভূমি। ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই অঞ্চলকে "লেভান্ট" নামে অভিহিত করেন। লেভান্ট শব্দটি এসেছে ফরাসি "লেভে" থেকে, যার অর্থ উদিত হওয়া (সূর্যের উদয়)। ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল সূর্যোদয়ের দেশ। কিন্তু এই ভূমির বাসিন্দাদের কাছে এটি ছিল জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দোলাচলের এক রঙ্গমঞ্চ।

ভৌগোলিকভাবে কানান ছিল এক বিচিত্র মিশ্রণ। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের নীল জলরাশি, পূর্বে লেবানন পর্বতমালা ও বিরোধী-লেবানন পর্বতমালার (Anti-Lebanon Mountains) সুউচ্চ শৃঙ্গ, এবং মাঝখানে উর্বর উপত্যকা ও মালভূমি। উত্তরে প্রবাহিত হতো ওরোন্টেস নদী, দক্ষিণে জর্ডান নদী তার পথ খুঁড়ে নিয়েছিল মৃত সাগর পর্যন্ত। এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্য একদিকে যেমন কৃষি ও বাণিজ্যের পথ খুলে দিয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে এনেছিল চরম অনিশ্চয়তা।

এই অঞ্চলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এর জলবায়ুগত ভঙ্গুরতা। কানান ছিল উর্বর চন্দ্রকলার (Fertile Crescent) পশ্চিম প্রান্ত। উর্বর চন্দ্রকলা নামক বিশাল ভূখণ্ডটি মেসোপটেমিয়া থেকে শুরু করে পূর্ব ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু মেসোপটেমিয়ার মতো বড় বড় নদীর (ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস) নিয়মিত প্লাবনভূমি কানানের ভাগ্যে ছিল না। কানানের কৃষি প্রধানত নির্ভর করত বৃষ্টির উপর। এখানকার কৃষক আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। যদি শরৎকালের শেষের দিকে এবং শীতকালের শুরুতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হতো, তাহলে যব, গম, জলপাই, আঙ্গুর আর ডুমুরের ফলন হতো প্রচুর। তখন এই ভূমি সত্যিই "দুধ ও মধুর প্রবাহীভূমি" হয়ে উঠত, যেমনটি তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু যদি বৃষ্টি না হতো? অথবা বৃষ্টি যদি অসময়ে হতো কিংবা খুব কম হতো? তাহলে সেই একই ভূমি পরিণত হতো মৃত্যুকূপে। খরা হতো নিয়মিত সঙ্গী। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে (Old Testament) বারবার দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে দুর্ভিক্ষের কারণে মিশরে যেতে হয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর পুরো কাহিনিই আবর্তিত হয়েছে সাত বছরের দুর্ভিক্ষকে কেন্দ্র করে। কানানের সমগ্র মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে ছিল এই বৃষ্টির অনিশ্চয়তা।

কৃষিনির্ভর সমাজ: বৃষ্টিই জীবন, খরাই মরণ

আজকের দিনে আমরা খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বুঝি বাজার, আমদানি-রপ্তানি কিংবা হিমাগার। কিন্তু প্রাচীন কানানে, একটি পরিবারের পুরো বছরের খাদ্য নির্ভর করত সেই বছরের ফসলের উপর। আর সেই ফসল নির্ভর করত আকাশের অদৃশ্য ইশারায়। এই পরিস্থিতি কানানীয়দের মধ্যে এক ধরনের গভীর অস্তিত্বের সংকট (Existential Anxiety) তৈরি করেছিল। মনোবিজ্ঞান বলছে, মানুষ যখন কোনো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন সে অদৃশ্য শক্তির কাছে সেই নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তর করে। সেটাই হয়েছিল কানানীয়দের ক্ষেত্রে।

তারা লক্ষ্য করল, আকাশে যখন মেঘ গর্জন করে, বিদ্যুৎ চমকায়, তখনই বৃষ্টি নামে। তারা এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলোকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে শুরু করল। তাদের ধারণা হলো, এই যে বজ্রপাত, এটা কোনো যান্ত্রিক ঘটনা নয়; এটা কোনো এক সত্তার ক্রোধ অথবা শক্তির প্রকাশ। এই যে বৃষ্টি, এটা নিছক জলীয় বাষ্প নয়; এটা কোনো দেবতার দান বা আশীর্বাদ।

প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের (Ancient Near East) প্রায় প্রতিটি সংস্কৃতিতেই আবহাওয়া ও উর্বরতার সাথে সংশ্লিষ্ট দেবতার দেখা মেলে। মেসোপটেমিয়ায় ছিল এনলিল ও আদাদ, মিশরে ছিল সেত ও ওসিরিস, আনাতোলিয়ায় ছিল তেশুব। কানানীয়রাও তাদের নিজস্ব আবহাওয়া দেবতা তৈরি করল, যার নাম তারা দিল হাদাদ। এবং এই হাদাদই পরবর্তীতে পরিচিতি লাভ করল "বাল" নামে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয়। কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য" (সূরা যারিয়াত: ৫৬)। কিন্তু মানুষ যখন সেই একক ইবাদত থেকে বিচ্যুত হয়, তখন সে তার সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজনগুলোকেই

দেবতা বানিয়ে ফেলে। কানানের মানুষের জন্য সবচেয়ে জরুরি প্রয়োজন ছিল পেটের ভাত ও পরিবারের নিরাপত্তা। আর তাই রিজিক (খাদ্য ও বৃষ্টি) হয়ে গেল তাদের উপাসনার কেন্দ্রবিন্দু।

উর্বরতার দেবতা ধারণার জন্ম

কানানের কৃষি শুধু বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ছিল না, নির্ভরশীল ছিল জমির উর্বরতার উপরও। তাই তারা কেবল একজন বজ্র ও বৃষ্টির দেবতাই কল্পনা করেনি, কল্পনা করেছিল সমগ্র একটি পরিবার বা প্যান্থিয়ন (Pantheon), যেখানে প্রত্যেক সদস্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ছিল।

এই প্যান্থিয়নের শীর্ষে ছিলেন এল (El), যাকে তারা মনে করত পরম পিতা বা স্রষ্টা। এল ছিলেন বয়স্ক, জ্ঞানী কিন্তু কিছুটা নিষ্ক্রিয় দেবতা। তারপরেই ছিলেন তার পুত্র বাল (Ba'al), যিনি ছিলেন সক্রিয়, যুবক, বলশালী এবং পৃথিবীর বৃষ্টি ও উর্বরতা নিয়ন্ত্রণকারী যোদ্ধা দেবতা। বালের সঙ্গিনী ছিলেন আনাত (Anat), যিনি ছিলেন যুদ্ধ ও প্রেমের দেবী। আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ দেবী ছিলেন আশেরা (Asherah), যিনি ছিলেন এল-এর স্ত্রী এবং সমুদ্রের দেবী, তাকে প্রায়ই উর্বরতার প্রতীক হিসেবে পূজা করা হতো।

এই পৌরাণিক কাহিনির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাল ও মৃত্যুর দেবতা মোতের (Mot) মধ্যে সংঘর্ষের গল্প। প্রাচীন উগারিতের (Ugarit) মাটির ফলকে (Tablets) খোদিত এই গল্প অনুযায়ী, বাল একবার মৃত্যুর দেবতা মোতের কাছে পরাজিত হন এবং পাতালে চলে যান। বাল মারা যাওয়ায় পৃথিবীতে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, ফসল শুকিয়ে যায়, খরা নেমে আসে। তখন বালের বোন আনাত যুদ্ধ করে মোতকে পরাজিত করে বালকে পাতাল থেকে উদ্ধার করে আনে। বালের পুনরুত্থানের সাথেই পৃথিবীতে আবার বৃষ্টি নামে এবং প্রকৃতি আবার সবুজ হয়ে ওঠে।

এই গল্পটির সাথে প্রাচীন কৃষিজীবী সমাজের মনস্তত্ত্বের গভীর সংযোগ রয়েছে। প্রকৃতিতে আমরা যে ঋতু পরিবর্তন দেখি (গ্রীষ্মের খরা ও শীতের বৃষ্টি), তা তারা ব্যাখ্যা করত দেবতাদের জীবনচক্রের মাধ্যমে। শীতকালে যখন বৃষ্টি হতো, তারা ভাবত বাল জীবিত ও সক্রিয়। গ্রীষ্মকালে যখন খরা পড়ত, তারা ভাবত বাল মৃত বা বন্দী। তাই খরার সময় তারা বিলাপ করত, শোক পালন করত, এবং জটিল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বালকে পুনরুত্থিত করার চেষ্টা করত। ঠিক এই আচারগুলোই একসময় ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল, যার কথা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।

তথ্যসূত্র ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ:

১৯২৮ সালে সিরিয়ার উপকূলে রাস শামরা (Ras Shamra) নামক স্থানে উগারিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত মাটির ফলকগুলোতে (Ugaritic Texts) বাল, এল, আনাত ও মোতের পৌরাণিক কাহিনী বিস্তারিতভাবে লেখা আছে। এই ফলকগুলো খ্রিস্টপূর্ব ১৪শ শতকের। এই প্রাচীন সাহিত্যই আমাদের জানিয়ে দেয়, ইলিয়াস (আ.)-এর সময়ে কানানীয়রা যে বালের পূজা করত, তার শিকড় কত গভীর ও প্রাচীন ছিল।

কানানীয় মনস্তত্ত্ব ও একেশ্বরবাদের দ্বন্দ্ব

কানান ভূমি ছিল শুধু কানানীয়দেরই আবাস নয়। আল্লাহ তাআলা এই ভূমিতেই হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে হিজরত করে এনেছিলেন। এখানেই বসবাস করেছিলেন হযরত ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার পর বনী ইসরাইল যখন মিশরে চলে যায় এবং পরবর্তীতে হযরত মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বে আবার এই ভূমিতে ফিরে আসে, তখন তারা একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। তারা এক আল্লাহর ইবাদত করত, কিন্তু চারপাশের কানানীয় সমাজ ছিল মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত।

তাওরাতের (Old Testament) বইগুলোতে বারবার বর্ণিত হয়েছে কিভাবে বনী ইসরাইল বারবার এই কানানীয় দেবতা বিশেষ করে বাল ও আশেরার পূজায় লিপ্ত হয়েছে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতিহাসবিদ ও ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, কানানীয় ধর্ম ছিল অত্যন্ত ইন্দ্রিয়গত (Sensual) ও প্রকৃতিনির্ভর। এক আল্লাহর ইবাদত ছিল বিমূর্ত ও নৈতিকতানির্ভর। যখনই বনী ইসরাইলের ঈমান দুর্বল হতো, কিংবা যখনই তারা কৃষিকাজ শুরু করে কানানীয়দের মতো প্রকৃতির অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতো, তখনই তারা সহজ ও ইন্দ্রিয়গত বালপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ত।

এই দ্বন্দ্বই পরবর্তীতে ইলিয়াস (আ.)-এর মিশনের পটভূমি তৈরি করে। আমরা দেখতে পাই, ইলিয়াস (আ.) শুধু একটি মূর্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেননি; তিনি লড়াই করেছিলেন একটি গোটা বিশ্বাসব্যবস্থার (Worldview) বিরুদ্ধে। সেই বিশ্বাসব্যবস্থা যেখানে রিজিকের মালিক আল্লাহ নন, বরং বাল।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১-এর শেষে)

পাঠক, এই অধ্যায় পড়ার পর একটু থামুন। প্রাচীন কানানের সেই কৃষকের কথা ভাবুন, যে বছরের পর বছর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত এক ফোঁটা পানির আশায়। তার এই ভয় কি আমাদের একেবারেই অপরিচিত? আজ আমরা হয়তো আকাশের দিকে তাকাই না, কিন্তু আমরা তাকাই আমাদের মোবাইলের স্ক্রিনে কখন বসের মেসেজ আসে, কখন বেতনের নোটিফিকেশন আসে, কখন ব্যবসার কোনো খবর আসে। আমরা কি আমাদের রিজিকের ভরসা কোনো 'সিস্টেম', কোনো 'মার্কেট', কিংবা কোনো 'ক্ষমতাবান ব্যক্তির' উপর এমনভাবে করে ফেলেছি, যেভাবে কানানীয়রা বালের উপর করত?

আজকের চিন্তা: আমার দৈনন্দিন জীবনে আমি কোন জিনিসটির অভাবে সবচেয়ে বেশি ভয় পাই? সেই ভয়টি কি আমাকে কখনো আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে ঠেলে দিয়েছে?

অধ্যায় ২: "বাল" শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কিভাবে ভৌগোলিক বাস্তবতা কানানীয়দের মনে বাল দেবতার ধারণার জন্ম দিয়েছিল। এবার আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করব। আমরা বিশ্লেষণ করব "বাল" শব্দটি নিজেই। কারণ শব্দগুলো কখনোই নিরপেক্ষ নয়। প্রতিটি শব্দ তার পেটে বহন করে শতাব্দীর পর শতাব্দীর ইতিহাস, সংস্কৃতি আর বিকৃতির গল্প। "বাল" শব্দটি একই সাথে অত্যন্ত সাধারণ এবং ভয়ানক রকমের গভীর। এর আক্ষরিক অর্থ যতটা নিরীহ, ইতিহাসে এর ব্যবহার ততটাই ভয়াবহ।

'প্রভু' বা 'স্বামী' অর্থের বিকৃতি: শব্দের সেমেটিক যাত্রা

"বাল" (Ba'al বা Baal) শব্দটি এসেছে প্রাচীন সেমেটিক ভাষার ধাতু ب ع ل (বা-আইন-লাম) থেকে। আরবি, হিব্রু, আরামাইক ও উগারিতিক এই সবগুলো ভাষাই সেমেটিক ভাষা পরিবারের সদস্য। এই সকল ভাষায় بعل (বাল) শব্দের মূল অর্থ একটিই: মালিক, প্রভু, স্বামী, অথবা কোনো কিছুর অধিকারী।

পবিত্র কোরআনে এই শব্দটি আমরা বিভিন্ন অর্থে দেখতে পাই।

- সূরা বাকারার ২২৮ নম্বর আয়াতে এসেছে: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ" – "এবং তাদের স্বামীরা তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বেশি হকদার।" এখানে بُعُولَةُ (বু'উলাহ) অর্থ স্বামী।
- সূরা হুদের ৭২ নম্বর আয়াতে হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর স্ত্রী সারাহ বলছেন: "وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا" – "আর এই যে আমার স্বামী, বৃদ্ধ অবস্থায়!" এখানে بَعْلِي (বা'লী) অর্থ আমার স্বামী।

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, বাল শব্দটি মূল আরবি ভাষায় একটি বৈধ ও পবিত্র শব্দ ছিল, যা দ্বারা স্বামী বা অভিভাবক বোঝানো হতো। কিন্তু কানানীয় সংস্কৃতিতে এসে এই একই শব্দ কিভাবে এক ভয়ঙ্কর দেবতার নামে পরিণত হলো, সেটাই ইতিহাসের নির্মম পরিহাস।

যখন কোনো কানানীয় কৃষক তার জমির ফলনের জন্য বৃষ্টির প্রার্থনা করত, তখন সে তার দেবতাকে সম্বোধন করত "হে বাল" অর্থাৎ "হে প্রভু" অথবা "হে মালিক"। প্রথম দিকে এটা হয়তো ছিল আল্লাহ তাআলার জন্যই ব্যবহৃত একটি উপাধি। যেমন আমরা বলি "রব" (প্রভু) অথবা "মালিক"। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা এই উপাধিটিকেই একটি স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করে বসল। তারা ভাবতে শুরু করল, আকাশের মেঘ ও বৃষ্টির একজন নির্দিষ্ট "মালিক" বা "বাল" আছেন। তারা আর তার আসল নাম জানার চেষ্টা করল না; বরং উপাধিটিকেই নাম বানিয়ে ফেলল।

এই প্রক্রিয়াটি শিরকের ইতিহাসে খুবই পরিচিত। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, নূহ (আ.)-এর জাতির পাঁচজন নেককার ব্যক্তি ছিলেন ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাসর। তারা যখন মারা যান, তখন মানুষ তাদের স্মরণে মূর্তি বানায়। প্রথমে তা ছিল শ্রদ্ধার প্রতীক। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ধীরে ধীরে এই মূর্তিগুলোকেই উপাসনার বস্তু বানিয়ে ফেলে। (সহীহ বুখারী, তাফসীর ইবনে কাসির)।

ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল 'বাল' উপাধিটি নিয়ে। আল্লাহর একটি গুণ বা উপাধি (প্রভু) ধীরে ধীরে একটি স্বাধীন দেবতার নাম হয়ে গেল। প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক উইলিয়াম ফক্সওয়েল অলব্রাইট (William Foxwell Albright) তাঁর "Yahweh and the

Gods of Canaan" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "প্রাথমিক যুগে ইসরাইলীয়রাও মাঝেমধ্যে ইয়াহওয়েহকে 'বাল' বলে সম্বোধন করত, কিন্তু যখন কানানীয় বালপূজার ভয়াবহতা স্পষ্ট হলো, তখন তারা এই শব্দটি পরিত্যাগ করে।"

বালের বিভিন্ন রূপ: একাধিক মুখোশের আড়ালে একই শয়তানি ফাঁদ

পৃথিবীর যেখানেই বালপূজা ছড়িয়েছে, সেখানেই স্থানীয় সংস্কৃতি ও ভূগোল অনুযায়ী সে ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপ ধারণ করেছে। এটি শয়তানের আরেকটি পুরনো কৌশল একই মিথ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন মোড়কে উপস্থাপন করা, যাতে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়। আমরা এখানে বালের তিনটি প্রধান রূপ নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলোর উল্লেখ ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়।

১. বাল-হাদাদ (Ba'al Hadad)

এটিই ছিল বালের সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রধান রূপ। হাদাদ ছিল ঝড়, বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা। উগারিতের ফলকে বাল-হাদাদকে 'মেঘের আরোহী' (Rider of the Clouds) বলা হয়েছে। তার হাতে থাকে একটি গদা (Mace) এবং একটি বজ্রপাতের প্রতীক। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় হাদাদের মন্দির ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপনা।

- প্রতীক: ষাঁড়। ষাঁড় ছিল শক্তি ও উর্বরতার প্রতীক। বাল-হাদাদের মূর্তিতে প্রায়ই তাকে একটি ষাঁড়ের পিঠে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখা যায়, অথবা তার মাথায় থাকে ষাঁড়ের শিং।
- আবহাওয়ার সাথে সম্পর্ক: মানুষ বিশ্বাস করত, আকাশে মেঘের গর্জন হলো বাল-হাদাদের কণ্ঠস্বর। বজ্রপাত হলো তার নিক্ষিপ্ত অস্ত্র। বৃষ্টি হলো তার বিজয়ের ফল।

২. বাল-জেবুব (Ba'al Zebub)

এই নামটি আমরা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের রাজাবলি পুস্তকে পাই। ইসরাইলের রাজা আহসিয়া যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন তিনি ইক্রোণ (Ekron) শহরে অবস্থিত 'বাল-জেবুবের' মন্দিরে দূত পাঠান, জিজ্ঞাসা করতে যে তিনি সুস্থ হবেন কিনা। তখনই আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে পাঠান রাজার দূতদের পথ আটকাতে। (২ রাজাবলি ১:২-১৬)। বাল-জেবুব শব্দের অর্থ "মাছির প্রভু" (Lord of the Flies)। ধারণা করা হয়, ইক্রোণ শহরে এই দেবতাকে রোগ নিরাময় ও মহামারী দূর করার দেবতা হিসেবে পূজা করা হতো। রোগ ও পচনের সাথে মাছির সম্পর্ক থাকায়, মানুষ মনে করত এই দেবতা মাছিদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর মাধ্যমেই রোগ সারাতে বা ঘটাতে পারে। পরবর্তীতে ইহুদি ও খ্রিস্টান ঐতিহ্যে এই বাল-জেবুব নামটি বিকৃত হয়ে যায় বিলজিবাব (Beelzebub) বা বিলজিবুল (Beelzebul) নামে, এবং তাকে শয়তানের রাজপুত্র বা স্বয়ং শয়তান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিউ টেস্টামেন্টে (ইঞ্জিল) ফরীশীরা হযরত ঈসা (আ.)-কে অভিযোগ করেছিল যে, "সে ভূতদের রাজপুত্র বিলজিবুলের সাহায্যে ভূত তাড়ায়।" (মথি ১২:২৪)। এখান থেকে বোঝা যায়, বালপূজার আত্মা ছিল সরাসরি শয়তানের সাথে সম্পর্কিত।

৩. বাল-পেওর (Ba'al Peor)

এটি ছিল বালপূজার সবচেয়ে জঘন্য ও ইন্দ্রিয়গত রূপ। তাওরাতের সংখ্যা পুস্তকে (Book of Numbers) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যখন বনী ইসরাইল মোয়াব দেশের প্রান্তরে শিটিম উপত্যকায় অবস্থান করছিল, তখন তারা মোয়াবীয় নারীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে 'বাল-পেওর'-এর পূজায় লিপ্ত হয়। (গণনা পুস্তক ২৫:১-৯)।

পেওর ছিল মোয়াবের একটি পাহাড়ের নাম। বাল-পেওর ছিল সেই পাহাড়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। এই পূজার বৈশিষ্ট্য ছিল যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নগ্নতা। উর্বরতা বৃদ্ধির নামে এই মন্দিরে প্রকাশ্য ব্যভিচার করা হতো। এর ফলে বনী ইসরাইলের মধ্যে মহামারী ছড়িয়ে পড়ে এবং আল্লাহর ক্রোধে চব্বিশ হাজার লোক মারা যায়। পরবর্তীতে পিনহাস (ফিনিয়াস) নামক এক যুবক এই পাপের প্রতিবাদে এক ইসরাইলি পুরুষ ও এক মিদিয়ানী নারীকে একসাথে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করে হত্যা করলে আল্লাহর ক্রোধ থামে।

বাল-পেওর-এর ঘটনা আমাদের শেখায় যে, রিজিক ও উর্বরতার নামে শয়তান কিভাবে মানুষকে পশুত্বের চরম পর্যায়ে নামিয়ে দেয়।

সংশ্লিষ্ট কোরআনের ইঙ্গিত:

পবিত্র কোরআনে বাল-পেওর বা বাল-জেবুবের নাম সরাসরি না এলেও, ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে বালের যে ধারণা দেওয়া হয়েছে, তা এই সকল রূপের সমষ্টিগত চিত্র। সূরা আরাফের ১৩৮ নম্বর আয়াতে বনী ইসরাইলের একটি অংশ যখন সমুদ্র পার হওয়ার

পর এক মূর্তিপূজক সম্প্রদায়কে দেখে মুসা (আ.)-কে বলে, "হে মুসা, ওদের যেমন দেবতা আছে, আমাদের জন্যও তেমন একটি দেবতা বানিয়ে দাও," তখন মুসা (আ.) তাদের তিরস্কার করেছিলেন। এই ঘটনা প্রমাণ করে বনী ইসরাইলের অন্তরে কানানীয় ধর্মের প্রতি আকর্ষণ ছিল কত প্রবল।

বালের মূর্তির বর্ণনা ও প্রতীকী তাৎপর্য

একটি ধর্মের মূর্তিতত্ত্ব (Iconography) সেই ধর্মের অন্তর্নিহিত বিশ্বাসকে প্রকাশ করে। বালের যে মূর্তিগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে পাওয়া গেছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা বালপূজার আত্মাকে স্পষ্ট দেখতে পাই।

১. ষাঁড়ের শিং ও দেহ:

ব্রোঞ্জ যুগের শেষের দিকে ও লৌহ যুগে (যে সময়ে ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাব) কানান অঞ্চলে পাওয়া বালের ছোট ব্রোঞ্জ মূর্তিগুলোতে দেখা যায়, একজন পুরুষ দেবতা তার ডান হাত উঁচু করে বর্শা নিক্ষেপের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন, অথবা তিনি সিংহাসনে বসে আছেন। তার মাথায় থাকে একটি শিরস্ত্রাণ, যার উপরের দিকে দুটি ষাঁড়ের শিং প্রসারিত।

- ষাঁড়: প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে ষাঁড় ছিল শক্তি, বীর্য ও উর্বরতার চূড়ান্ত প্রতীক। একটি ষাঁড় যেমন তার পালের মালিক ও রক্ষক, তেমনি বালও তার উপাসকদের মালিক ও রক্ষক এই ধারণাই এখানে প্রতিষ্ঠিত। এই ষাঁড়ের প্রতীকী তাৎপর্য এতই প্রবল ছিল যে, পরবর্তীতে বনী ইসরাইলের প্রথম রাজা জারবিয়াম (Jeroboam) যখন তার প্রজাদের জেরুজালেমের মন্দিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চাইলেন, তখন তিনি উত্তর ইসরাইলের দান ও বেথেল শহরে দুটি সোনার বাছুরের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। (১ রাজাবলি ১২:২৮-৩০)। এটা ছিল মিশর থেকে বের হওয়ার সময় হযরত হারুন (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইলের বাছুর পূজার পুনরাবৃত্তি। ইতিহাস যেন নিজেকেই ফিরিয়ে আনে।

২. বজ্রপাত ও বল্লম (Spear):

বালের ডান হাত প্রায়ই উঁচু করা থাকে, যেন তিনি বল্লম বা বজ্র নিক্ষেপ করছেন। এটি তার যোদ্ধা সত্তার প্রকাশ। কানানীয় পুরাণে বাল হলেন সেই যোদ্ধা, যে সমুদ্রের দেবতা ইয়াম (Yam) ও মৃত্যুর দেবতা মোতকে (Mot) পরাজিত করে বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন। বৃষ্টি দেওয়ার অর্থই হলো অন্ধকার ও খরার শক্তির বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা। এই কারণে তার মূর্তি সর্বদা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে থাকে।

৩. শঙ্কু আকৃতির টুপি ও দাড়ি:

মূর্তিগুলোতে বালের মাথায় একটি লম্বা শঙ্কু আকৃতির টুপি দেখা যায়। প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় দেবতাদের এ ধরনের টুপি পরিধানের রীতি ছিল। এটি ছিল দেবত্বের প্রতীক। তার দাড়ি ছিল কোঁকড়ানো ও সুসজ্জিত, যা প্রাচীন সেমিটিক রাজকীয়তার প্রতীক।

ধর্মীয় বিকৃতির শারীরিক প্রতিমা:

এই মূর্তিগুলো দেখলে বোঝা যায়, মানুষ তার নিজের কল্পনার সর্বোচ্চ শক্তি ও ক্ষমতা দিয়ে এই দেবতাকে সাজিয়েছে। কিন্তু কোরআন এই মূর্তিগুলোর অসারতা সম্পর্কে বারবার সতর্ক করেছে। সূরা হজ্জের ৭৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে মানবজাতি, একটি উপমা দেওয়া হলো, মনোযোগ দিয়ে শোনো: আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ডাকো, তারা একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই একত্রিত হয়। আর যদি মাছিটি তাদের থেকে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তারা তার থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না।"

একটি মাছিও তৈরি করতে পারে না, অথচ মানুষ তাকে বজ্র ও বৃষ্টির মালিক ভাবত!

বাল বনাম আল্লাহ: নামের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সত্য

একটি চমৎকার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এখানে উল্লেখযোগ্য। আরবিতে بعل (বাল) অর্থ মালিক বা প্রভু। আর আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হলো الملك (আল-মালিক) এবং رب (রব)। কিন্তু পার্থক্য কোথায়? বাল হলো সেই প্রভু, যার ক্ষমতা সীমিত, যে স্থানীয় (একটি পাহাড়, একটি শহর বা একটি ফসলের ক্ষেতের মালিক), যে মৃত্যুর কাছে পরাজিত হয় (মোতের গল্প অনুযায়ী) এবং যার অস্তিত্ব নির্ভর করে মানুষের কল্পনা ও মূর্তির উপর।

পক্ষান্তরে আল্লাহ হলেন رب العالمين (রব্বুল আলামীন) সমগ্র জগতের প্রভু। তিনি স্থানীয় নন, সর্বব্যাপী। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না, বরং তিনিই মৃত্যু ও জীবনের মালিক। আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি কোনো মূর্তির মুখাপেক্ষী নন; বরং তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি الصمد (আস-সমাদ) যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

ইলিয়াস (আ.) যখন বললেন, "তোমরা কি বালকে ডাকো আর শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?" তখন তিনি এই মৌলিক পার্থক্যটিই তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, তোমাদের এই 'প্রভু' তো এক টুকরো পাথর, যে নিজেই সৃষ্টি। আর যিনি আসমান-জমিনের স্রষ্টা, সেই আহসানুল খালিকীন (শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা)-কে তোমরা ভুলে গেছ।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ২-এর শেষে)

পাঠক, আমরা এতক্ষণ বালের নাম, রূপ ও প্রতীক নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন নিজের দিকে তাকানোর সময়। বালের মূর্তিতে আমরা দেখেছি শিং, বজ্র আর রাজদন্ড। এগুলো হলো শক্তি, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রতীক।

আমাদের আধুনিক জীবনে এই প্রতীকগুলো কী? হতে পারে আপনার দেয়ালে টাঙানো সেই ডিগ্রির সার্টিফিকেট, যেটাকে আপনি নিজের যোগ্যতার একমাত্র প্রমাণ মনে করেন। হতে পারে আপনার ভিজিটিং কার্ডের নিচে থাকা পদবীটি। হতে পারে আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের শেষের সেই অল্প কয়েকজন শূন্য। এই জিনিসগুলো কি আপনার কাছে 'বালের শিং'-এর মতো হয়ে উঠেছে? আপনি কি এগুলোকে এতটাই শক্তির উৎস ভাবতে শুরু করেছেন যে, এগুলো ছাড়া আপনি নিজেকে অসহায় মনে করেন?

মনে রাখবেন, বালের মূর্তি যেমন তার পূজারীদের বাঁচাতে পারেনি, তেমনি এই আধুনিক প্রতীকগুলোও একদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। শুধু আল্লাহর সত্তাই চিরস্থায়ী।

অধ্যায় ৩: রিজিকের ভয় ও শয়তানের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ফাঁদ

পূর্ববর্তী অধ্যায় দুটোতে আমরা দেখেছি কিভাবে এক টুকরো ভূমি ও তার জলবায়ু মানুষের মনে বালের ধারণার জন্ম দিয়েছিল এবং কিভাবে সেই ধারণা এক ভয়ঙ্কর ধর্মীয় কাঠামোয় পরিণত হয়েছিল। এবার আমরা প্রবেশ করব সেই অন্ধকার কূপের সবচেয়ে নিচের তলায়। আমরা জানবো, বালপূজার আসল চেহারাটা কী ছিল, যে চেহারা দেখলে আজও ইতিহাসের পাতা রক্তে ভিজে যায়। এটা সেই জায়গা, যেখানে রিজিকের ভয় মানুষকে পরিণত করেছিল পশুর চেয়েও নিকৃষ্টতর এক সত্তায়।

ইবলিশের কৌশল: জৈবিক চাহিদাকে কেন্দ্র করে আধ্যাত্মিক পতন

ইবলিশের বিদ্রোহের ইতিহাস আমাদের সবার জানা। যখন আল্লাহ তাআলা আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের সেজদা করার আদেশ দিলেন, তখন ইবলিশ অহংকার করে সেটা প্রত্যাখ্যান করল। তার যুক্তি ছিল: "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।" (সূরা সাদ: ৭৬)। এরপর ইবলিশ আল্লাহর কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল। সে বলল: "হে আমার রব, আপনি যেহেতু আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের জন্য পৃথিবীতে (পাপকে) শোভনীয় করে দেব এবং তাদের সকলকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব।" (সূরা হিজর: ৩৯)।

কিন্তু ইবলিশ কিভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে? সে কি সরাসরি এসে বলে, "তুমি আল্লাহকে ভুলে যাও"? কখনোই না। ইবলিশ অত্যন্ত ধূর্ত। সে মানুষের সবচেয়ে মৌলিক ও জৈবিক চাহিদাগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা, নিরাপত্তাহীনতা এই চাহিদাগুলো আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন টিকে থাকার জন্য। কিন্তু ইবলিশ এই চাহিদাগুলোকে ব্যবহার করে মানুষের আধ্যাত্মিক পতন ঘটায়।

রিজিকের ভয় হলো ইবলিশের সবচেয়ে পুরনো ও কার্যকর অস্ত্রগুলোর একটি। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে: "الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا" – "শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের।" (সূরা বাকারা: ২৬৮)।

এই আয়াতটিই বালপূজার সমগ্র মনস্তত্ত্বের চাবিকাঠি। প্রাচীন কানানের সেই কৃষকের কথা ভাবুন। তার সন্তানেরা ক্ষুধার্ত। আকাশে মেঘ নেই। এই অবস্থায় শয়তান তার মনে ফিসফিস করে বলল: "তুমি তো দেখতেই পাচ্ছ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেও কাজ হচ্ছে না।

নিশ্চয়ই আকাশের এই দেবতা বাল রেগে আছেন। তাকে শান্ত করতে হবে। তাকে কিছু দিতে হবে। তুমি কি তোমার সন্তানের চেয়ে বেশি ভালোবাসো এমন কিছু দিতে পারবে?" এভাবেই জন্ম নেয় আত্মাহুতির (Human Sacrifice) মতো জঘন্য প্রথা।

বালপূজার পুরোহিতরা এই ভয়কে পুঁজি করে গড়ে তুলেছিল এক সুসংহত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তারা মানুষকে বোঝাত, ফসল ভালো করতে হলে, গবাদি পশু বাঁচাতে হলে, বৃষ্টি নামাতে হলে বালের ক্রোধ প্রশমন করতে হবে। আর এই প্রশমনের উপায় হলো রক্ত। এবং শুধু সাধারণ রক্ত নয়; সবচেয়ে পবিত্র, সবচেয়ে প্রিয় রক্ত তোমাদের সন্তানের রক্ত।

আত্মাহুতি ও শিশুবলি: ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়

এটা পড়তে গিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে: এটা কি শুধুই অতিরঞ্জিত কোনো পৌরাণিক গল্প, নাকি সত্যিই এমন ঘটনা ঘটত? দুর্ভাগ্যজনকভাবে, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন সাহিত্যের প্রমাণ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রাখে না। কানান অঞ্চলে শিশুবলি ছিল একটি প্রাতিষ্ঠানিক ও সুসংহত ধর্মীয় আচার।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ: টোফেট (Tophet)

কানানের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারগুলোর একটি হলো টোফেট। টোফেট শব্দটি হিব্রু বাইবেলে ব্যবহৃত হয়েছে জেরুজালেমের কাছে হিন্নোম উপত্যকার (Valley of Hinnom বা Gehenna) একটি স্থানকে বোঝাতে, যেখানে ইসরাইলীয়রাও কানানীয়দের অনুকরণে শিশুবলি দিত। বাইবেলে বর্ণিত আছে: "তারা বেন-হিন্নোম উপত্যকায় টোফেটের উঁচু স্থানগুলো নির্মাণ করল, যেন তাদের ছেলেমেয়েদের আগুনে পুড়িয়ে বলি দিতে পারে যা আমি আদেশ করিনি, এবং যা আমার মনেও আসেনি।" (যিরমিয় ৭:৩১)।

আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা কার্থেজ (Carthage) শহরে (যা ছিল ফিনিশীয়দের একটি উপনিবেশ এবং যেখানে কানানীয় ধর্মের প্রভাব ছিল) টোফেট নামে বিশেষ কবরস্থান আবিষ্কার করেছেন। এখানে হাজার হাজার পোড়া শিশুর অস্থি ও ভস্মাবশেষ সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। অনেকগুলো কলসের গায়ে লেখা আছে, "টানিতের মুখের জন্য" অথবা "বাল হামোনের জন্য"। টানিত ও বাল হামোন ছিল কার্থেজীয়দের প্রধান দেবতা, যাদের উদ্দেশ্যে এই শিশুদের বলি দেওয়া হতো।

শুধু কার্থেজ নয়, সিরিয়া ও লেবাননের বিভিন্ন প্রাচীন কানানীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষেও (যেমন গেজের, মেগিদ্দো) শিশুদের কঙ্কাল পাওয়া গেছে বড় বড় দালানের ভিত্তির নিচে বা দেয়ালের গাঁথুনির মধ্যে। এগুলোকে ভিত্তি বলি (Foundation Sacrifice) বলা হয়। মানুষ বিশ্বাস করত, একটি বাড়ি বা শহরের প্রাচীর মজবুত করতে হলে একটি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ দিতে হবে, যাতে তার আত্মা সেই স্থাপনার রক্ষক হয়।

তথ্যসূত্র: প্রাচীন ইতিহাসবিদদের বর্ণনা

গ্রিক ইতিহাসবিদ দিওদোরাস সিকুলাস (Diodorus Siculus) এবং প্লুতার্ক (Plutarch) কার্থেজের শিশুবলির ভয়াবহ বর্ণনা দিয়েছেন। তারা লিখেছেন, শহরের মাঝখানে ক্রোনোস (যাকে বাল-হামোনের সাথে তুলনা করা হয়) নামে দেবতার একটি বিশাল ব্রোঞ্জের মূর্তি ছিল। মূর্তিটির হাত দুটি প্রসারিত ছিল এবং তা নিচের দিকে ঢালু ছিল। যখন কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের সন্তানকে বলি দিতে আসত, তারা শিশুটিকে মূর্তির হাতের উপর রাখত। তারপর শিশুটি গড়িয়ে পড়ত মূর্তির ভেতরে জ্বলন্ত আগুনের চুল্লিতে।

প্লুতার্ক আরও লিখেছেন, এই আচারের সময় শিশুর কান্না যাতে মা-বাবা বা উপস্থিত লোকজন শুনতে না পায়, সেজন্য পুরোহিতরা চারদিকে বিকট শব্দে বাঁশি, ঢাক ও তূর্য বাজাত। মায়েরা দাঁড়িয়ে থাকতেন পাথরের মূর্তির মতো, তাদের চোখে জল থাকলেও কান্নার শব্দ করা নিষেধ ছিল। যদি কোনো মা কাঁদতেন, তাহলে মনে করা হতো তার ত্যাগ কবুল হলো না এবং ভবিষ্যতে আরও বড় বিপদ আসবে।

তামার মূর্তি, আগুন ও ঢাকের শব্দ: মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এই আচারগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, শয়তান কিভাবে মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি ও ভালোবাসাকে বিকৃত করে দিয়েছিল।

১. প্রিয়তম বস্তুর উৎসর্গ: ইসলামে কুরবানির বিধান আছে। কিন্তু ইসলামের কুরবানি হলো একটি পশু উৎসর্গ করা, যার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং গরিবদের মাঝে গোশত বিতরণ করা হয়। কিন্তু বালের পুরোহিতরা শিক্ষা দিত, "আল্লাহ

নয়, বালই তোমাদের রিজিকদাতা। তাই তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস তারই প্রাপ্য।" এভাবে তারা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের পবিত্রতম অনুভূতিকে এক ভয়ঙ্কর অপরাধে পরিণত করেছিল।

২. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিষ্ঠুরতা (Sensory Overload & Brutality): আগুন, রক্ত, বিকট শব্দ এই সবকিছু মিলিয়ে পরিবেশটা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠত যে মানুষের স্বাভাবিক বিবেকবুদ্ধি স্তব্ধ হয়ে যেত। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, তীব্র শব্দ ও আতঙ্কের পরিবেশ মানুষের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং সে সহজেই পরামর্শের বশীভূত হয়।

৩. পুণ্যের মুখোশে পাপ: পুরোহিতরা এই কাজকে 'পবিত্রতম ত্যাগ' বলে চিহ্নিত করত। তারা বলত, যে বাবা-মা তাদের সন্তানকে বালের জন্য দেয়, তারা বালের কাছে বিশেষ মর্যাদা পায় এবং ভবিষ্যতে তাদের ফসলে বরকত হবে। অর্থাৎ, একটি জঘন্যতম পাপকে তারা পুণ্যের আসনে বসিয়েছিল।

কোরআনের দৃষ্টিতে আত্মাহুতি ও শিশুহত্যা

ইসলাম শুধু এই প্রথাকে নিন্দা করেনি, বরং এর শিকড়কে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলেছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা তৎকালীন আরব সমাজের আরেকটি জঘন্য প্রথা কন্যা শিশু হত্যা (وأد البنات) এর তীব্র নিন্দা করেছেন। সূরা তাকভীরের ৮-৯ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: "وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ" – "যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যা শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?"

যদিও আরবের কন্যা হত্যার কারণ ছিল দারিদ্র্যের ভয় ও লজ্জা, আর কানানের শিশুবলির কারণ ছিল ধর্মীয় উৎসর্গ, কিন্তু উভয়ের মূলে ছিল একই রোগ রিজিকের ভয় ও অজ্ঞতা। ইসলাম এসে ঘোষণা করল: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ" – "তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের ও তোমাদের রিজিক দিয়ে থাকি।" (সূরা আনআম: ১৫১)।

ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা এই আয়াতেরই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বালপূজা ছিল রিজিকের ভয়ে সন্তান হত্যার চূড়ান্ত রূপ। ইলিয়াস (আ.) এসে প্রমাণ করলেন, রিজিকের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়।

শয়তানের ফাঁদ: আধুনিক যুগের সাথে সংযোগ

এই অধ্যায় শেষ করার আগে আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। আমরা এই ইতিহাস পড়ছি কেন? আমরা কি শুধুই একটা ঘৃণা জাগানো কাহিনি জানার জন্য এত সময় ব্যয় করছি?

ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা কোরআনে উল্লেখ করার কারণ হলো, বালের ফাঁদ কখনো পুরনো হয় না, কেবল তার চেহারা বদলায়।

সেই প্রাচীন কৃষক যেমন এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় তার সন্তানকে আগুনে ফেলত, আজকের যুগের পিতা-মাতা কি ভিন্ন কিছু করছেন? আমরা হয়তো আমাদের সন্তানদের জ্বলন্ত আগুনের চুল্লিতে ফেলছি না। কিন্তু আমরা কি তাদেরকে দুনিয়ার ক্যারিয়ারের চুল্লিতে ঠেলে দিচ্ছি না, যেখানে তাদের ঈমান, চরিত্র ও আখেরাত পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে?

- যখন একজন পিতা তার মেয়েকে পর্দা করতে নিষেধ করেন, কারণ "সমাজে চলতে গেলে এসব ছেড়ে দিতে হয়, নাহলে ভালো চাকরি হবে না" তখন তিনি কি 'বালের পুরোহিত'-এর ভূমিকা পালন করছেন না?
- যখন একজন মা তার ছেলেকে বলেন, "সালাত পড়ার পরে সময় হবে, আগে এই প্রজেক্টটা শেষ করো, নাহলে প্রমোশন হবে না" তখন তিনি কি সেই মায়েদের মতো নন, যারা বালের মূর্তির সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন?
- যখন আমরা হারাম উপার্জনের টাকায় সন্তানের জন্য দামি স্কুল ও ভালো খাবারের ব্যবস্থা করি, তখন আমরা কি আসলে সেই আগুনই জ্বালাচ্ছি না, যে আগুনে আমাদের সন্তানের আখেরাত পুড়বে?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে, যে দুনিয়াতে অনেক সম্পদ অর্জন করেছে, কিন্তু তা হারাম পথে উপার্জন করেছে এবং হারাম পথেই ব্যয় করেছে। তাকে বলা হবে, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাও।" (সহীহ মুসলিম)।

সেদিন সেই পিতা তার সন্তানের জন্য কিছুই করতে পারবে না।

ব্যক্তিগত অনুশীলন: নিজের ভেতরের বালকে চেনা

এই অধ্যায়ের শেষে, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি একটি কঠিন কিন্তু সৎ আত্মসমালোচনার জন্য। নিচের প্রশ্নগুলো নিজেকে করুন। উত্তর কাউকে বলতে হবে না। এটা আপনার ও আপনার রবের মধ্যে গোপন থাকুক।

১. আমার জীবনে এমন কোন সিদ্ধান্ত আছে, যেটা আমি শুধুমাত্র 'রিজিকের ভয়ে' নিয়েছি, অথচ জানতাম সেটা আল্লাহর পছন্দনীয় নয়?

২. আমার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য দোয়া ও তাওয়াক্কুলের পরিবর্তে আমি কি শুধুমাত্র দুনিয়াবী পরিকল্পনার উপর ভরসা করছি? আমি কি মনে করি, "আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু আমার পরিশ্রমই যথেষ্ট"?

৩. যখন আমি দেখি অন্য কেউ হারাম পথে উন্নতি করছে, তখন কি আমার মনে ঈর্ষা হয় এবং আমার ঈমান নড়বড়ে হয়?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে, ইলিয়াস (আ.)-এর দল আমাদের কাতারে আছেন, নাকি আমরা এখনও বালের মন্দিরের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি।

পরবর্তী পর্বে আমরা জানবো, কিভাবে এই ভয়ঙ্কর বালপূজা বনী ইসরাইলের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল এবং কিভাবে একজন সাহসী নবী সেই অন্ধকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

তথ্যসূত্র (প্রথম পর্বের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা সাফফাত, বাকারা, আনআম, হিজর, সাদ, আরাফ, তাকভীর।
২. তাফসীর ইবনে কাসির (সূরা সাফফাত ১২৩-১৩২)।
৩. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ১ রাজাবলি, ২ রাজাবলি, যিরমিয়, গণনা পুস্তক।
৪. "Stories of the Prophets" – ইবনে কাসির (ইংরেজি অনুবাদ)।
৫. "Yahweh and the Gods of Canaan" – William Foxwell Albright.
৬. "The Canaanites" – John Gray.
৭. "Ugaritic Texts" – Ras Shamra Excavation Reports.
৮. "The History of the Ancient Near East" – Marc Van De Mieroop.
৯. "Carthage: A History" – Serge Lancel (Tophet excavations).
১০. Diodorus Siculus, "Library of History" (Book ২০).
১১. Plutarch, "Moralia" (On Superstition).

দ্বিতীয় পর্ব: দাউদ (আ.)-এর উত্তরাধিকার থেকে পথভ্রষ্ট রাজা

ইতিহাসের গতিপথ কখনো সরলরেখায় চলে না। একটি মহান সভ্যতার উত্থান ও পতনের মাঝে লুকিয়ে থাকে শতাব্দীর শিক্ষা, সতর্কবার্তা এবং মানব প্রকৃতির চিরন্তন দুর্বলতার কাহিনি। প্রথম পর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি কিভাবে প্রাচীন কানান ভূমিতে বালপূজা নামক এক ভয়ঙ্কর আধ্যাত্মিক ব্যাধির জন্ম হয়েছিল এবং কিভাবে তা রিজিকের ভয়ে মানুষকে পশুত্বের চরম সীমায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যাধি শুধুমাত্র কানানীয় পৌত্তলিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক অধ্যায়টি হলো, যখন এই একই ব্যাধি প্রবেশ করেছিল আল্লাহর মনোনীত জাতি বনী ইসরাইলের মধ্যে। যে জাতির জন্য আল্লাহ তাআলা সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন, আসমান থেকে মান্না-সালওয়া নাজিল করেছিলেন এবং অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছিলেন, সেই জাতিই একসময় বালের মন্দিরে সেজদা দিয়েছিল এবং আল্লাহর নবীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। এই পর্বে আমরা সেই হৃদয়বিদারক ইতিহাসের সাক্ষী হবো যে ইতিহাস শুরু হয় হযরত দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর স্বর্ণযুগের পর, এবং গিয়ে শেষ হয় এক পথভ্রষ্ট রাজা ও এক পাপিষ্ঠা রানির সিংহাসনে।

অধ্যায় ৪: বনী ইসরাঈলের বিভক্তি ও পাপের স্রোত

বনী ইসরাইলের ইতিহাস মানবজাতির জন্য এক অনন্য দর্পণ। এই জাতির উত্থান-পতনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সকল উম্মতের জন্য শিক্ষার উপকরণ রেখেছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার বনী ইসরাইলের ঘটনা উল্লেখ করে আমাদের সতর্ক করেছেন, যেন আমরা সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করি। সূরা বাকারার একটি বড় অংশজুড়ে, সূরা আলে ইমরানে, সূরা মায়েদায় এবং বিশেষ করে সূরা বনী ইসরাঈলে তাদের উত্থান-পতনের বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। বালপূজার প্রসার এবং ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে বুঝতে হবে, কিভাবে দাউদ (আ.) ও সুলাইমান (আ.)-এর সুসংহত সাম্রাজ্যটি ধীরে ধীরে বিভক্ত হয়ে আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল।

হযরত সুলাইমান (আ.)-এর পরবর্তী রাজনৈতিক পটভূমি: একতাই যেখানে ছিল শক্তি, বিভক্তিই যেখানে হলো দুর্বলতা

হযরত দাউদ (আ.) ছিলেন বনী ইসরাইলের ইতিহাসে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে ছিলেন নবী, রাজা, সেনাপতি এবং জাবুর কিতাবের প্রাপক। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে বলেছেন: "وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ" – "আর আমি তাঁর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও মীমাংসাকারী বাক্য।" (সূরা সাদ: ২০)। দাউদ (আ.)-এর হাতেই প্রথম বনী ইসরাইলের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং জেরুজালেমকে রাজধানী করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ফিলিস্তিনীদের (Philistines) পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল থেকে মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ আসে তাঁর পুত্র হযরত সুলাইমান (আ.)-এর সময়ে। সুলাইমান (আ.)-এর রাজত্ব সম্পর্কে কোরআনে আল্লাহ তাআলা যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি শুধু একজন নবীই ছিলেন না, বরং এমন এক রাজা ছিলেন যাঁর কাছে এমন সব ক্ষমতা ছিল যা পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আর কাউকে দেওয়া হয়নি। জিন-ইনসান ও পশু-পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা, বাতাসকে বশীভূত করার ক্ষমতা, এবং বিশাল নির্মাণকাজ সম্পাদনের ক্ষমতা এসবই ছিল আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। সূরা নমলে বর্ণিত রানি বিলকিসের ঘটনা আমাদের জানিয়ে দেয় সুলাইমান (আ.)-এর সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি ও মর্যাদা কত সুদূরপ্রসারী ছিল।

কিন্তু ইতিহাসের নিয়তি হলো, স্বর্ণযুগ কখনো চিরস্থায়ী হয় না। সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর পরপরই বনী ইসরাইলের সাম্রাজ্যের ভিত নড়বড়ে হতে শুরু করে। এর পেছনে ছিল কয়েকটি মৌলিক কারণ, যা আমরা যদি বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখব যে কোনো জাতির পতনের পেছনে এই কারণগুলোই বারবার কাজ করে। প্রথমত, সুলাইমান (আ.)-এর জীবনের শেষ দিকে তাঁর কিছু স্ত্রীর প্রভাবে কানানীয় দেবদেবীর পূজার প্রতি এক ধরনের শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, যদিও কোরআন স্পষ্টভাবে সুলাইমান (আ.)-কে কুফর থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছে (সূরা বাকারা: ১০২)। দ্বিতীয়ত, সুলাইমান (আ.)-এর বিশাল নির্মাণ প্রকল্প ও বিলাসবহুল জীবনযাপনের জন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষের উপর প্রচুর করের বোঝা চাপানো হয়েছিল, যা পরবর্তীতে অসন্তোষের কারণ হয়। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণটি ছিল গোত্রীয় বিভাজন ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব।

সুলাইমান (আ.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র **রাহবিয়াম (Rehoboam)** সিংহাসনে বসেন। রাহবিয়ামের রাজ্যাভিষেকের সময় ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্রের প্রতিনিধিরা তাঁর কাছে একটি আবেদন নিয়ে আসেন। তাদের নেতা ছিলেন **যারবিয়াম বিন নাবাত (Jeroboam bin Nebat)** , যিনি পূর্বে সুলাইমান (আ.)-এর অধীনে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন কিন্তু পরে বিদ্রোহী হয়ে মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিরা রাহবিয়ামকে বলেন, "আপনার পিতা আমাদের উপর ভারী জোয়াল চাপিয়েছিলেন। এখন আপনি যদি আমাদের উপর থেকে এই কঠোর পরিশ্রম ও ভারী করের বোঝা হালকা করেন, তাহলে আমরা আপনার অনুগত থাকব।" (১ রাজাবলি ১২:৪)।

রাহবিয়াম এখানে একটি চরম ভুল করলেন। তিনি বয়স্ক ও অভিজ্ঞ উপদেষ্টাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তার যুবক বন্ধুদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। তিনি উত্তরাঞ্চলের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে কঠোর ভাষায় বললেন, "আমার পিতা তোমাদের ভারী জোয়াল চাপিয়েছিলেন, আমি আরও ভারী করব। আমার পিতা তোমাদের চাবুক দিয়ে শাসন করতেন, আমি বিচ্ছু দিয়ে শাসন করব।" (১ রাজাবলি ১২:১১)। এই একটি মাত্র বাক্য পুরো সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিল।

উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্র তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারা ঘোষণা করল: " داؤد کے خاندان سے ہمارا کیا حصہ؟ یسی کے بیٹے سے ہماری کوئی میراث نہیں۔ اے اسرائیل! اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جا۔ اب اے داؤد! تُو اپنے ہی گھر کا خیال کر۔" – "দাউদের পরিবারে আমাদের কী অংশ? যিশয়ের পুত্রে আমাদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। হে ইসরাইল! তোমরা নিজ নিজ তাঁবুতে

ফিরে যাও। হে দাউদ! তুমি এখন নিজের ঘরই সামলাও।" (১ রাজাবলি ১২:১৬)। যারবিয়ামকে তারা উত্তর ইসরাইলের রাজা হিসেবে ঘোষণা করল। রাহবিয়াম শুধুমাত্র দক্ষিণের দুটি গোত্র ইয়াহুদা (Judah) ও বিনইয়ামিন (Benjamin) নিয়ে গঠিত যিহুদা রাজ্যের (Kingdom of Judah) রাজা হিসেবে থেকে গেলেন, যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম।

এভাবেই একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। উত্তর ইসরাইল রাজ্যের রাজধানী প্রথমে শিখেম (Shechem) এবং পরে তির্সা (Tirzah) হয়ে সর্বশেষ শমরিয়া (Samaria) তে স্থাপিত হয়। দক্ষিণ যিহুদা রাজ্যের রাজধানী রইল জেরুজালেমে, যেখানে সুলাইমান (আ.)-এর নির্মিত বায়তুল মুকাদ্দাস অবস্থিত ছিল। এই বিভক্তি কেবল রাজনৈতিক ছিল না; এটি ছিল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। আর এই বিভক্তিই পরবর্তীতে বালপূজাকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

উত্তর ইসরাইল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিপর্যয়ের সূত্রপাত

উত্তর ইসরাইলের প্রথম রাজা যারবিয়াম একটি কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি ছিলেন। তাঁর প্রজারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে জেরুজালেমের পবিত্র মন্দিরে (বায়তুল মুকাদ্দাস) গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে অভ্যস্ত ছিল। সেখানেই ছিল তাওরাতের সিন্দুক, সেখানেই ছিল হযরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)-এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্রতম স্থান। কিন্তু এখন যেহেতু উত্তর ইসরাইল একটি পৃথক রাজ্য, যারবিয়াম আশঙ্কা করলেন যে, যদি তাঁর প্রজারা নিয়মিত জেরুজালেমে যায়, তাহলে ধীরে ধীরে তাদের আনুগত্য আবার দাউদ (আ.)-এর বংশের প্রতি ফিরে যাবে এবং তারা তাঁকে হত্যা করে রাহবিয়ামের সাথে মিলে যাবে।

এই রাজনৈতিক ভয় থেকে যারবিয়াম এমন এক সিদ্ধান্ত নিলেন, যা বাইবেলের ভাষায় "যারবিয়ামের পাপ" (The Sin of Jeroboam) নামে চিহ্নিত এবং যা পুরো উত্তর ইসরাইল রাজ্যকে আধ্যাত্মিক ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি তাঁর রাজ্যের দুই প্রান্তে উত্তরে দান (Dan) শহরে এবং দক্ষিণে বেথেল (Bethel) শহরে **দুটি স্বর্ণনির্মিত বাছুরের মূর্তি** স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন: "হে ইসরাইল! জেরুজালেমে যাওয়া তোমাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। এই দেখো, এই সেই দেবতা, যিনি তোমাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছিলেন।" (১ রাজাবলি ১২:২৮)।

এই কাজটি ছিল অত্যন্ত জঘন্য ও প্রতীকী তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ছিল হযরত মুসা (আ.)-এর অনুপস্থিতিতে বনী ইসরাইল কর্তৃক সোনার বাছুর পূজার ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যারবিয়াম ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেননি; বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লোভে তিনি সেই একই পাপের পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি শুধু মূর্তি স্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি একটি সম্পূর্ণ বিকল্প ধর্মীয় ব্যবস্থা গড়ে তুললেন। তিনি হারুন (আ.)-এর বংশধর লেবীয়দের (Levites) পরিবর্তে সাধারণ মানুষদের মধ্য থেকে পুরোহিত নিয়োগ করলেন। তিনি জেরুজালেমের উৎসবগুলোর বিকল্প হিসেবে নতুন নতুন ধর্মীয় উৎসবের প্রচলন করলেন। মূলত, তিনি **রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শিরকের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ** করলেন।

এখানেই শেষ নয়। যারবিয়ামের পরবর্তী রাজারা এই পথ আরও প্রশস্ত করলেন। উত্তর ইসরাইলের রাজারা একের পর এক কানানীয় দেবতা, বিশেষ করে বাল ও আশেরার পূজা গ্রহণ করতে লাগলেন। কারণ রাজনৈতিকভাবে তারা ভাবতেন, কানানীয়দের মতো উর্বরতা ও বৃষ্টির দেবতার পূজা করলে তাদের কৃষি অর্থনীতি শক্তিশালী হবে। আল্লাহর প্রতি তাদের ভরসা ছিল না; বরং তাদের ভরসা ছিল মূর্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির ওপর। পবিত্র কোরআনে বনী ইসরাইলের এই মানসিকতার সমালোচনা করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: " فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ" – "অতঃপর যখন তারা তাদের উপদেশ ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য সবকিছুর দরজা খুলে দিলাম। এমনকি যখন তারা তাদের প্রদত্ত বস্তুসমূহে উৎফুল্ল হলো, তখন আমি তাদের হঠাৎ পাকড়াও করলাম, ফলে তারা নিরাশ হয়ে গেল।" (সূরা আনআম: ৪৪)।

উত্তর ইসরাইলের রাজারা যতই বালপূজায় লিপ্ত হয়েছে, ততই আল্লাহ তাআলা তাদের সতর্ক করার জন্য একের পর এক নবী প্রেরণ করেছেন। এই নবীদের মধ্যে ছিলেন **ইলিয়াস (আ.)**, **আল-ইয়াসা (আ.)**, **ইউনুস (আ.)**, **আমোস (Amos)** এবং **হোসেয়া (Hosea)** । কিন্তু ইসরাইলের রাজা ও জনগণ এই নবীদের কথা শোনেনি; বরং তারা নবীদের উপহাস করেছে, নির্যাতন করেছে এবং হত্যা করেছে। এই প্রেক্ষাপটেই ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাব এবং রাজা আহাবের সাথে তাঁর দ্বন্দ্বের কাহিনি আমাদের সামনে আসে।

ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ:

ইতিহাসবিদ ও ধর্মতাত্ত্বিকরা একমত যে, বনী ইসরাইলের বিভক্তি ছিল তাদের জাতীয় জীবনে এক স্থায়ী দুর্বলতার সূচনা। এই বিভক্তি তাদের শুধু রাজনৈতিকভাবেই দুর্বল করেনি, বরং ধর্মীয়ভাবেও তাদের চরম পতনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। দক্ষিণের যিহুদা রাজ্যে দাউদ (আ.)-এর বংশধররা রাজত্ব করতেন এবং সেখানে মাঝে মাঝে কিছু নেককার রাজার (যেমন আসা, যিহোশাফাট, হিজকিয়া,

যোশিয়া) উত্থান হতো, যারা সংস্কার এনে মূর্তিপূজা দূর করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু উত্তর ইসরাইলে যারবিয়ামের পর আর কোনো নেককার রাজা আসেননি। বাইবেলের ভাষায়, উত্তর ইসরাইলের প্রতিটি রাজাই "যারবিয়ামের পাপে লিপ্ত ছিলেন এবং ইসরাইলকে পাপ করিয়েছিলেন।"

এই পাপের তালিকা দীর্ঘ। যারবিয়ামের পুত্র নাদাব (Nadab) নিহত হন বাশা (Baasha) নামক এক সেনাপতির হাতে। বাশা এবং তার পুত্র এলাহ (Elah)-ও একই পথ অনুসরণ করেন। এরপর সেনাপতি জিমরি (Zimri) মাত্র সাত দিন রাজত্ব করে আত্মহত্যা করেন। এরপর অমরি (Omri) নামক এক শক্তিশালী সেনাপতি ক্ষমতা দখল করেন। অমরিই উত্তর ইসরাইলের রাজধানী হিসেবে শমরিয়া নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীতে ইলিয়াস (আ.)-এর মিশনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। অমরির পুত্রই হলো সেই কুখ্যাত **রাজা আহাব (Ahab)** , যার নাম ইতিহাসে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হয়ে আছে এবং যার স্ত্রী **রানি ইজেবেল (Jezebel)** বালপূজার প্রসারে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বনী ইসরাইলের ধর্মীয় পতনের শিক্ষা: আমাদের জন্য সতর্কবার্তা

এই অধ্যায়ের শেষে আমাদের থামতে হবে এবং নিজেদের দিকে তাকাতে হবে। বনী ইসরাইলের এই ইতিহাস কি শুধুই একটি প্রাচীন গল্প? নাকি এটা আমাদের নিজেদের সমাজেরই প্রতিচ্ছবি? যারবিয়াম কেন সোনার বাছুর বানিয়েছিলেন? শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে, জেরুজালেমে গেলে মানুষ আল্লাহর ঘরের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং তার আনুগত্য নষ্ট হবে। আধুনিক মুসলিম সমাজে আমরা কি একই কাজ করছি না? আমরা কি রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে দ্বীনের কিছু অংশকে বিকৃত করছি না? আমরা কি বলি না, "এখন সময় বদলেছে, দ্বীনের কিছু বিধান আপাতত স্থগিত রাখতে হবে, নইলে আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে"?

যারবিয়ামের তৈরি করা ধর্ম ছিল একটি **সুবিধাবাদী ধর্ম**। তিনি বলেছিলেন, "জেরুজালেম যাওয়া কষ্টকর।" অর্থাৎ, সত্যের পথে কষ্ট আছে, তাই তিনি সহজ পথ বাতলে দিলেন। আজকের দুনিয়ায় আমাদের চারপাশে এমন কত শত "যারবিয়াম" আছেন, যারা আমাদের বলেন, "পর্দা করা কষ্টকর, হালাল খাওয়া কষ্টকর, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া কষ্টকর একটু আধুনিক হও, সহজ পথে চলো।" এই ডাক শয়তানের ডাক। ইলিয়াস (আ.)-এর দল আমাদের হতে হবে, যারা কষ্ট জেনেও এক আল্লাহর পথে অটল থাকেন।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৪-এর শেষে):

১. আমি কি কখনো দ্বীনের কোনো বিধানকে "কষ্টকর" মনে করে তা পরিত্যাগ করেছি বা শিথিল করেছি?

২. আমার জীবনে এমন কোনো "সুবিধাবাদী সিদ্ধান্ত" আছে কি, যা আমি দ্বীনদারির চেয়ে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে নিয়েছি?

৩. বনী ইসরাইলের বিভক্তি থেকে আমরা আমাদের মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের জন্য কী শিক্ষা নিতে পারি?

অধ্যায় ৫: রাজা আহাব ও রানি ইজেবেল – এক বিষাক্ত অধ্যায়

উত্তর ইসরাইল রাজ্যের ইতিহাসে রাজা আহাবের নামটি রক্তিম অক্ষরে লেখা। তিনি শুধু একজন পাপী রাজাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন এমন এক শাসক, যার আমলে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বালপূজা তার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল এবং আল্লাহর নবীদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। আহাবের রাজত্বকাল (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৮৭৪-৮৫৩) ছিল বনী ইসরাইলের ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলোর একটি। কিন্তু এই অন্ধকারের কেন্দ্রে শুধু আহাব একা ছিলেন না; তাঁর পাশে ছিলেন এক নারী রানি ইজেবেল যিনি ছিলেন বালপূজার ধর্মান্ধ প্রচারক এবং যার নাম ইতিহাসে চিরকালের জন্য নারীরূপী শয়তানের প্রতিভূ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই বিষাক্ত দম্পতির উত্থান, তাদের কৃতকর্ম এবং তাদের বিরুদ্ধে ইলিয়াস (আ.)-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের পটভূমি বিস্তারিতভাবে জানব।

ইজেবেল: ফিনিশীয় রাজকন্যা ও বালপূজার ধর্মান্ধ প্রচারক

ইজেবেল কে ছিলেন? তিনি ছিলেন ফিনিশীয়দের (Phoenicians) বিখ্যাত নগরী **সীদোনের (Sidon)** রাজকন্যা। তাঁর পিতা ছিলেন সীদোনের রাজা **ইতবা'al (Ethbaal)** , যার নামের অর্থই হলো "বালের সাথে" (With Baal)। ফিনিশীয়রা ছিল মূলত কানানীয়দেরই উত্তরসূরি এবং তারা ছিল সমুদ্রগামী বণিক জাতি। তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেছিল এবং তাদের সবচেয়ে বড় উপনিবেশ ছিল উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ। ফিনিশীয়দের প্রধান দেবতা ছিলেন **বাল** (যাকে তারা বাল-হামোন বা

মেলকার্ত নামেও ডাকত) এবং দেবী **আশেরা** ও **আশতার্ত**। ইজেবেল এই পরিবেশেই বড় হয়েছিলেন এবং বালপূজার প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অন্ধ ও ধর্মান্ধ প্রকৃতির।

রাজা অমরি যখন তাঁর পুত্র আহাবের জন্য ইজেবেলের সাথে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান, তখন তা ছিল একটি রাজনৈতিক চুক্তি। উত্তর ইসরাইল রাজ্য ছিল স্থলবেষ্টিত এবং অর্থনৈতিকভাবে ফিনিশীয়দের মতো শক্তিশালী ছিল না। ফিনিশীয়দের সাথে মৈত্রী হলে ইসরাইলের বাণিজ্যিক সুবিধা হতো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে একটি মিত্র পাওয়া যেত। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিবাহের মূল্য ছিল আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত চড়া। ইজেবেল যখন ইসরাইলে আসেন, তখন তিনি সাথে নিয়ে আসেন তার দেবতা বালের পূজারী পুরোহিতদের, তার সংস্কৃতি এবং তার ধর্মীয় উন্মাদনা।

আহাবের সাথে বিবাহের পর ইজেবেল শুধু রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী এবং ক্ষমতালোভী। তিনি চেয়েছিলেন, উত্তর ইসরাইলের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে **ইয়াহওয়েহ্ (এক আল্লাহর ইবাদত)** -এর পরিবর্তে **বালপূজা** প্রতিষ্ঠিত হোক। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন: আহাব নিজেও হয়তো আল্লাহকে পুরোপুরি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত এবং ইজেবেলের প্রভাবে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, "ইসরাইলের রাজা আহাব তাঁর পূর্ববর্তী সকল রাজাদের চেয়ে বেশি পাপ করেছিলেন। আর এমনটা করা তাঁর কাছে সামান্য মনে হতো যে, তিনি যারবিয়ামের পাপে চলেন, তাই তিনি সীদোনের রাজা ইতবা'লের কন্যা ইজেবেলকে বিয়ে করলেন এবং গিয়ে বালের সেবা ও পূজা করলেন।" (১ রাজাবলি ১৬:৩০-৩১)।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মূর্তিপূজার প্রসার: শমরিয়ায় বালের মন্দির

ইজেবেলের প্ররোচনায় রাজা আহাব উত্তর ইসরাইলের রাজধানী **শমরিয়ায় (Samaria)** বালের জন্য একটি বিশাল মন্দির নির্মাণ করলেন। এটি ছিল রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মূর্তিপূজার চূড়ান্ত প্রকাশ। এই মন্দিরে তিনি বালের একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করলেন এবং সেখানে একটি বেদী তৈরি করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি **আশেরা** দেবীর জন্যও একটি মূর্তি ও উপাসনাস্থল তৈরি করলেন। এই কাজগুলো শুধু ধর্মীয় আচার ছিল না; এগুলো ছিল ইসরাইলের সেই সনাতন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা, যে ঐতিহ্য অনুযায়ী ইসরাইল জাতি এক আল্লাহর সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল।

রাজধানীতে মন্দির স্থাপনের পর ইজেবেল সারা দেশে বালপূজা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি সুসংহত পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি ফিনিশিয়া থেকে **৪৫০ জন বালের পুরোহিত** এবং **৪০০ জন আশেরা দেবীর পুরোহিত** এনে ইসরাইলে নিয়োগ দিলেন। এই পুরোহিতরা ছিল বালপূজার ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষিত এবং তারা ছিল ইজেবেলের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায়। এই পুরোহিতরা ইসরাইলের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বালপূজার প্রচার করতে লাগল এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে আনতে লাগল।

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থের জোরে বালপূজা উত্তর ইসরাইলে এক মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষ, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কানানীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে ছিল এবং যাদের মনে সবসময় রিজিকের ভয় কাজ করত, তারা সহজেই এই নতুন রাষ্ট্রীয় ধর্ম গ্রহণ করল। তারা ভাবতে লাগল, "রাজা-রানি যখন বালের পূজা করছেন এবং দেশে বৃষ্টি হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই বালই প্রকৃত শক্তিশালী দেবতা।" এভাবেই ধীরে ধীরে বনী ইসরাইলের সিংহভাগ মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দিয়ে বাল ও আশেরার মূর্তির সামনে সেজদা দিতে শুরু করল।

এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে, এটি কেবল একটি ভিন্ন ধর্মের প্রচলন ছিল না। এটি ছিল **চুক্তিভঙ্গ (Covenant Breaking)** । আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তার মূল শর্তই ছিল একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা এবং মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করা। তাওরাতের দশ আজ্ঞার (Ten Commandments) প্রথম ও প্রধান আজ্ঞাটিই হলো: "আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি তোমাদের মিশর দেশ থেকে, দাসত্বের ঘর থেকে বের করে এনেছি। তুমি আমার ছাড়া অন্য কোনো দেবতার পূজা করবে না।" (যাত্রাপুস্তক ২০:২-৩)। আহাব ও ইজেবেলের শাসনামলে এই প্রধান আজ্ঞাটিই পদদলিত হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে।

আল্লাহর নবীদের হত্যা ও সত্যকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র

ইজেবেলের ধর্মান্ধতা এখানেই থামেনি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বালপূজার প্রসারের সবচেয়ে বড় বাধা হলো সেই সব নবী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিরা, যারা এখনও এক আল্লাহর ইবাদত করেন এবং প্রকাশ্যে বালপূজার বিরুদ্ধে কথা বলেন। তাই তিনি এই বাধা দূর করার জন্য এক ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। তিনি রাজার নামে আদেশ জারি করলেন এবং তাঁর সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, যেখানেই আল্লাহর কোনো নবীকে পাওয়া যায়, তাঁকে যেন হত্যা করা হয়।

বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, এই গণহত্যার বিবরণ অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। রাজা আহাবের প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক **ওবদিয়া (Obadiah)** ছিলেন একজন গোপন খোদাভীরু ব্যক্তি। ইজেবেল যখন আল্লাহর নবীদের হত্যা করছিলেন, তখন ওবদিয়া গোপনে একশো জন নবীকে দুটি পৃথক গুহায় লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং নিজের খরচে তাঁদের রুটি ও পানি সরবরাহ করতেন। (১ রাজাবলি ১৮:৪, ১৩)। এই ওবদিয়াই পরবর্তীতে ইলিয়াস (আ.)-এর সাথে রাজা আহাবের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

ইজেবেল শুধু নবীদেরই হত্যা করছিলেন না, তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের বিকল্প হিসেবে বালের মন্দিরগুলোকে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর ঘরগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে দিচ্ছিলেন। তাওরাতের বিধান ও আল্লাহর আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে উপেক্ষা করা হচ্ছিল। যে জাতি একসময় আল্লাহর আইনে পরিচালিত হতো, সেই জাতি এখন চলছিল এক পৌত্তলিক রানির ইচ্ছা-অনিচ্ছায়।

এই পরিস্থিতিতে একজন মানুষের পক্ষে প্রকাশ্যে এক আল্লাহর কথা বলা মানে ছিল নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যখন অন্ধকার সবচেয়ে ঘনীভূত হয়, তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে প্রেরণ করেন। আর সেই নক্ষত্রই হলেন **হযরত ইলিয়াস (আ.)** ।

ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাব: মরুভূমি থেকে উঠে আসা কণ্ঠস্বর

হঠাৎ করেই ইতিহাসের মঞ্চে আবির্ভূত হলেন এক রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। বাইবেলের ভাষায়, "গিলিয়দের তিশবীবাসী ইলিয়াস" (Elijah the Tishbite of Gilead)। তাঁর জন্ম, বংশপরিচয় বা প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু তাঁর আগমন ছিল বজ্রপাতের মতো। তিনি কোনো রাজপ্রাসাদে বড় হননি, কোনো ধর্মীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তিনি এসেছিলেন জর্ডান নদীর পূর্ব তীরের রুক্ষ পাহাড়ি এলাকা গিলিয়দ থেকে। তাঁর পরনে ছিল মোটা পশমের পোশাক এবং কোমরে ছিল চামড়ার কোমরবন্ধ যা ছিল দুনিয়াবী বিলাসিতা ও আড়ম্বরের সম্পূর্ণ বিপরীত এক জীবনধারার প্রতীক।

তিনি সরাসরি রাজা আহাবের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো প্রকার ভূমিকা বা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ঘোষণা করলেন: **"জীবিত সদাপ্রভু ইসরাইলের ঈশ্বরের দিব্য, যাঁর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আগামী বছরগুলোতে শিশির বা বৃষ্টি কিছুই পড়বে না, শুধু আমার কথাতেই পড়বে।"** (১ রাজাবলি ১৭:১)।

এই একটি বাক্যই ছিল পুরো বালপূজা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ। বালকে মানা হতো বৃষ্টি ও উর্বরতার দেবতা হিসেবে। ইলিয়াস (আ.) ঘোষণা করলেন, বৃষ্টি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। এবং যতদিন না তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আবার ঘোষণা দেবেন, ততদিন এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়বে না। এই ঘোষণা ছিল ইজেবেলের সমস্ত ক্ষমতা ও বালের সমস্ত অহংকারের বিরুদ্ধে একটি আত্মবিশ্বাসী আঘাত।

একথা বলেই ইলিয়াস (আ.) অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি প্রথমে কেরীৎ (Kerith) নামক একটি ছোট নদীর তীরে গিয়ে আত্মগোপন করলেন, যেখানে কাকেরা তাঁর জন্য রুটি ও মাংস নিয়ে আসত। এরপর যখন খরায় সেই নদী শুকিয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাঁকে ফিনিশীয় অঞ্চলের সারিফত (Zarephath) নামক এক শহরে এক বিধবা নারীর কাছে পাঠালেন। সেখানে তিনি এক অলৌকিক ঘটনার জন্ম দিলেন সেই বিধবার অল্প কিছু আটা ও তেল সাড়ে তিন বছরের খরার পুরো সময়জুড়ে শেষ হলো না, আর পরবর্তীতে সেই বিধবার মৃত পুত্রকে আল্লাহর হুকুমে জীবিত করলেন।

এদিকে ইসরাইলে নেমে এলো ভয়াবহ এক খরা। টানা সাড়ে তিন বছর আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল না। যে বাল দেবতাকে মানুষ বৃষ্টির মালিক ভাবত, সে তাদের এক ফোঁটা পানি দিতে পারল না। ফসল পুড়ে গেল, গবাদি পশু মারা গেল, মানুষের মধ্যে দেখা দিল চরম দুর্ভিক্ষ। রাজা আহাব ও রানি ইজেবেল রাগে অন্ধ হয়ে ইলিয়াস (আ.)-কে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু আল্লাহ তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

এই সম্পূর্ণ ঘটনাটিই আমাদের পরবর্তী পর্বের মূল বিষয়বস্তু, যেখানে আমরা কারমেল পাহাড়ের মহা চ্যালেঞ্জ, আসমান থেকে আগুন আসা এবং বৃষ্টির প্রত্যাবর্তনের বিস্ময়কর কাহিনি জানব।

ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ: ইজেবেলের কৌশল ও তার পরিণতি

ইতিহাসবিদরা ইজেবেলকে একজন চরম উচ্চাভিলাষী, ধর্মান্ধ এবং নির্দয় শাসক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি শুধু তার নিজের ধর্মই প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তার স্বামীকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে বালপূজার সেবায় নিয়োজিত করতে।

বাইবেলের ঘটনা **নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের (Naboth's Vineyard)** কাহিনি তার চরিত্রের আরেকটি ভয়াবহ দিক উন্মোচন করে।

রাজা আহাব একবার তার প্রাসাদের পাশেই অবস্থিত নাবোত নামের এক সাধারণ ইসরাইলির দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি কিনতে চাইলেন, যাতে তিনি সেখানে একটি সবজি বাগান করতে পারেন। কিন্তু নাবোত তাওরাতের বিধান অনুযায়ী তার পূর্বপুরুষের ভূমি বিক্রি করতে রাজি হলেন না। রাজা আহাব এতে মনমরা হয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ইজেবেল এটা দেখে অবাক হয়ে বললেন, "তুমি কি ইসরাইলের রাজা নও? ওঠো, খাওয়া-দাওয়া করো এবং মন খুশ রাখো। আমি যিশ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি তোমাকে দেব।"

এরপর ইজেবেল রাজার নামে ও রাজমোহর ব্যবহার করে চিঠি লিখে নাবোতের শহরের প্রবীণদের কাছে পাঠালেন। সেই চিঠিতে নির্দেশ ছিল, নাবোতের বিরুদ্ধে ঈশ্বর ও রাজার নিন্দা করার মিথ্যা অভিযোগ এনে দুইজন মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করাতে হবে এবং তাকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নির্দোষ নাবোতকে হত্যা করা হলো। এরপর ইজেবেল আহাবকে গিয়ে বললেন, "ওঠো, নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রটি দখল করো, কারণ সে আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে।" (১ রাজাবলি ২১:১-১৬)।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, ইজেবেল শুধু ধর্মীয় দিক থেকেই বিপথগামী ছিলেন না, তিনি ছিলেন নৈতিকতা ও বিচারের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তার কাছে ক্ষমতাই ছিল সবকিছু, আর সেই ক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য তিনি যে কোনো জঘন্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। এই ধরনের শাসকের কবলে পড়লে একটি জাতির কী পরিণতি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

কোরআনের আলোকে আহাব-ইজেবেল ও ইলিয়াস (আ.)-এর দ্বন্দ্ব

পবিত্র কোরআনে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত অর্থবহভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরা আস-সাফফাতের ১২৩ থেকে ১৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" (১২৩) "আর নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রাসূলগণের একজন।"

"إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ" (১২৪) "যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?'"

"أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" (১২৫) "'তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?'"

"اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" (১২৬) "'আল্লাহ্ই তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব।'"

"فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" (১২৭) "কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই (জাহান্নামে) হাজির করা হবে।"

"إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" (১২৮) "শুধু আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।"

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ" (১২৯) "আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুনাম) রেখে দিয়েছি।"

"سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ" (১৩০) "ইলিয়াসের প্রতি সালাম।"

"إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" (১৩১) "নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।"

"إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ" (১৩২) "নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর মিশনের মূল সারাংশ তুলে ধরেছেন। তিনি "বাল" নামক নির্দিষ্ট মূর্তির পূজার বিরোধিতা করেছিলেন এবং মানুষকে আহ্বান করেছিলেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের দিকে। আয়াতগুলোর শেষে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য সালাম প্রেরণ করেছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য তাঁর সুনাম রেখে দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর কাছে কতটা প্রিয় এবং সম্মানিত ছিলেন।

তাফসীরে ইবনে কাসির-এ উল্লেখ করা হয়েছে, ইলিয়াস (আ.)-এর সম্প্রদায় ছিল বালবেক (Baalbek) নগরীর বাসিন্দা, যা বর্তমান লেবাননে অবস্থিত। বালবেক নামটিই এসেছে 'বাল' থেকে। অর্থাৎ এই শহরটি ছিল বাল দেবতার পূজার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াত ছিল এই মূর্তিপূজার কেন্দ্রস্থলেই। তিনি তাদের সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁর কথা মানেনি এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল।

কোরআনের বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে সম্পর্ক:

ইসলামী পণ্ডিতগণ বাইবেলের বর্ণনাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেন: (১) যা কোরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। (২) যা কোরআন ও হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক তা প্রত্যাখ্যাত। (৩) যা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীস নীরব তা সম্পর্কে আমরা নীরব থাকি, সত্য-মিথ্যা যাচাই করি না। ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার ক্ষেত্রে কোরআনের বক্তব্য হলো মূল ভিত্তি। বাইবেলের বিস্তারিত বর্ণনা থেকে আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যদি তা ইসলামী আকীদার পরিপন্থী না হয়। যেমন, বাইবেলে ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য কাকের খাবার আনা, বিধবার আটা-তেল শেষ না হওয়া, মৃত বালককে জীবিত করা এবং কারমেল পাহাড়ে আগুন আসার ঘটনা ইসলামী তাফসীরকারকগণ সাধারণত উল্লেখ করে থাকেন, কারণ এতে তাওহীদ ও নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ রয়েছে এবং তা কোরআনের মূল বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

আধুনিক সমাজে 'ইজেবেল' ও 'আহাব'-এর চরিত্রের পুনরাবৃত্তি

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের সমসাময়িক জীবনে। ইজেবেল ও আহাবের চরিত্র ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়নি; বরং তারা প্রতিটি যুগে, প্রতিটি সমাজে নতুন রূপে আবির্ভূত হয়।

কে আধুনিক 'ইজেবেল'? সে হতে পারে সেই সব শক্তি, মতবাদ বা ব্যক্তি, যারা ধর্মীয় মূল্যবোধকে পেছনে ফেলে রাষ্ট্র ও সমাজে অন্যায় ও পাপাচার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। হতে পারে সেটা একটি গণমাধ্যম, যা অশ্লীলতা ও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। হতে পারে সেটা একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যা তরুণ প্রজন্মকে তাদের ধর্মীয় পরিচয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। হতে পারে সেটা একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সুদের ভিত্তিতে চলছে এবং হালাল-হারামের তোয়াক্কা করে না।

কে আধুনিক 'আহাব'? তারা হলো সেই সব দুর্বলচিত্ত নেতা, ব্যবস্থাপক বা অভিভাবক, যারা জানে সত্য কী, কিন্তু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা সেই সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে ভয় পায়। তারা ভুলের প্রতিবাদ করে না; বরং ভুলের সাথে আপস করে বসে থাকে। তারা ভাবে, "আমি একা কী করব? সবাই তো এভাবেই চলছে।"

কিন্তু ইতিহাস আমাদের শেখায়, ইজেবেলের ক্ষমতা যতই ভয়ঙ্কর হোক না কেন, ইলিয়াস (আ.)-এর একক দাওয়াতের কাছে তা টিকতে পারেনি। কারমেল পাহাড়ের সেই আগুন ইতিহাসের ইজেবেলদের ভস্ম করে দিয়েছিল। আজও যদি আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর মতো সত্যের উপর অটল থাকতে পারি, তাহলে আধুনিক ইজেবেলদেরও সেই একই পরিণতি বরণ করতে হবে।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৫-এর শেষে)

পাঠক, এই অধ্যায় শেষে নিজের অন্তরকে প্রশ্ন করুন:

১. আমার চারপাশে এমন কোনো 'ইজেবেলি' প্রভাব আছে কি, যা আমাকে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে? আমি কি তা চিহ্নিত করতে পেরেছি?

২. আমি কি কখনো 'আহাব'-এর মতো দুর্বলতা দেখিয়েছি? অর্থাৎ, সত্য জেনেও পরিস্থিতির চাপে নীরব থেকেছি বা আপস করেছি?

৩. ইলিয়াস (আ.)-এর একাকী দাঁড়িয়ে যাওয়ার সাহস থেকে আমি নিজের জীবনের জন্য কী শিক্ষা নিতে পারি?

পরবর্তী পর্বে আমরা সরাসরি কারমেল পাহাড়ের সেই উত্তেজনাপূর্ণ ও ঈমান-জাগানিয়া মুহূর্তগুলোর সাক্ষী হবো, যেখানে ইলিয়াস (আ.) একা ৪৫০ জন বালের পুরোহিতকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং আসমান থেকে আগুন নেমে এসে সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছিল।

তথ্যসূত্র (দ্বিতীয় পর্বের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা সাফফাত (১২৩-১৩২), সূরা সাদ (২০), সূরা আনআম (৪৪)।
২. তাফসীর ইবনে কাসির (সূরা সাফফাত ১২৩-১৩২)।
৩. তাফসীরে তাবারি (সূরা সাফফাত)।
৪. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ১ রাজাবলি (১১ অধ্যায় থেকে ২১ অধ্যায়)।
৫. "Stories of the Prophets" – ইবনে কাসির (ইংরেজি অনুবাদ, অধ্যায়: ইলিয়াস)।

৬. "A History of Israel" – John Bright.
৭. "The Kings of Israel and Judah" – George Rawlinson.
৮. "The Oxford History of the Biblical World" – Michael D. Coogan (Editor).
৯. "Jezebel: The Untold Story of the Bible's Harlot Queen" – Lesley Hazleton.
১০. "Phoenicians and the Making of the Mediterranean" – Carolina Lôpez-Ruiz.

তৃতীয় পর্ব: তাওহীদের তলোয়ার — হযরত ইলিয়াস (আ.)

ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় ও ঈমান-উদ্দীপক অধ্যায়গুলোর একটি হলো হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন ও মিশন। যখন একটি জাতি সম্পূর্ণরূপে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত, যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্র সত্যকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর এক বিশেষ বান্দাকে প্রেরণ করেছিলেন তাওহীদের তলোয়ার হাতে। ইলিয়াস (আ.) কোনো সাধারণ নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক দুর্জয় সিংহ, যিনি একাকী দাঁড়িয়েছিলেন একটি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে। তাঁর হাতে ছিল না কোনো সৈন্যবাহিনী, ছিল না কোনো রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা; ছিল কেবল এক টুকরো অটুট ঈমান এবং আল্লাহর ওপর পাহাড়সম ভরসা। এই পর্বে আমরা সেই মহান নবীর জীবন, মিশন ও মুজিজার বিস্তারিত বিবরণ জানব। আমরা দেখব কিভাবে আল্লাহ তাআলা মিথ্যার সমস্ত দম্ভ চূর্ণ করে সত্যকে সমুন্নত করেছিলেন এবং কিভাবে ইলিয়াস (আ.)-এর সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অধ্যায় ৬: তিশবীয় বজ্র: ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাব

উত্তর ইসরাইল রাজ্যের আকাশ তখন অন্ধকারে ঢাকা। রাজা আহাব ও রানি ইজেবেলের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বালপূজা চরম আকার ধারণ করেছে। সত্যের পথে চলা মানুষজন গুহায় লুকিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, আর প্রকাশ্যে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। ঠিক এমন এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন এক রহস্যময় পুরুষ। তাঁর নাম ইলিয়াস। বাইবেলীয় ভাষায় তিনি "গিলিয়দের তিশবীবাসী ইলিয়াস" (Elijah the Tishbite of Gilead) নামে পরিচিত। কোরআনে তিনি **ইলিয়াস (إلياس)** নামে সম্মানিত। এই অধ্যায়ে আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাবের পটভূমি, কোরআনে তাঁর মর্যাদা এবং রাজপ্রাসাদে তাঁর সেই ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের বিস্তারিত বিবরণ জানব।

কোরআনে ইলিয়াস (আ.)-এর মর্যাদা ও প্রশংসা (সূরা সাফফাত ও আনআম)

পবিত্র কোরআনে ইলিয়াস (আ.)-এর নাম দুটি সূরায় উল্লিখিত হয়েছে সূরা আনআম ও সূরা আস-সাফফাত। যদিও ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখের মধ্যেই আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর মর্যাদা ও মহত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। সূরা আনআমের ৮৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা একাধিক নবীর নাম উল্লেখ করে বলেছেন:

"وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ"
"আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস প্রত্যেকেই ছিলেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে **সালিহীন (الصالحين)** বা সৎকর্মশীলদের তালিকাভুক্ত করেছেন। এটি একটি অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদার পরিচায়ক। কারণ আল্লাহ তাআলা যখন কোনো নবী বা ব্যক্তিত্বকে 'সালিহীন' আখ্যা দেন, তখন এর অর্থ তিনি শুধু নবীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন চরিত্র ও কর্মে সর্বোচ্চ মানবীয় গুণাবলীর অধিকারী। তিনি আল্লাহর প্রতিটি হুকুম পালনে এবং বান্দার প্রতিটি হক আদায়ে অনন্য ছিলেন।

কিন্তু ইলিয়াস (আ.)-এর মিশন ও দাওয়াতের বিস্তারিত চিত্র আমরা পাই সূরা আস-সাফফাতে। এখানে আল্লাহ তাআলা দশটি আয়াতে (১২৩-১৩২) ইলিয়াস (আ.)-এর কথা বলেছেন। এই আয়াতগুলোর তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) লিখেছেন, ইলিয়াস (আ.) ছিলেন হারুন (আ.)-এর বংশধর এবং তাঁকে বনী ইসরাইলের সেই অংশের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যারা বালবেক (Baalbek) নগরীতে বসবাস করত এবং **বাল** নামক মূর্তির পূজা করত। আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ" (১২৩)
"আর নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রাসূলগণের একজন।"

এখানে 'লামিনাল মুরসালীন' (রাসূলগণের অন্যতম) বলে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে সেই মহান কাফেলার সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যাঁদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানবজাতির কাছে সত্যের বাণী পৌঁছেছে। এই আখ্যাটিই তাঁর নবুয়তের সত্যতা ও গুরুত্বের সাক্ষ্য বহন করে।

"إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ" (১২৪)
"যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি আল্লাহকে ভয় করো না?'"

এই আয়াতটি ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াতের সারকথা তুলে ধরে। তিনি সরাসরি প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন: "তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না?" অর্থাৎ, তোমাদের অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই? তোমরা কি সেই সত্তাকে ভুলে গেছ, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, রিজিক দিয়েছেন এবং যাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে? এই প্রশ্নটি ছিল তাদের বিবেকের দরজায় সরাসরি আঘাত।

"أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" (১২৫)
"'তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?'"

এটি হলো ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াতের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বাল ছিল একটি জড় পদার্থের নাম, একটি পাথরের মূর্তি। অথচ মানুষ তাকে রিজিকদাতা ও বৃষ্টির মালিক মনে করে ডাকছে এবং সেই মহান সত্তাকে বর্জন করছে, যিনি **আহসানুল খালিকীন** শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নিজেকে 'আহসানুল খালিকীন' বলে অভিহিত করেছেন, যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ, মানুষ যা কিছু

বানায় (মূর্তি, প্রযুক্তি, ব্যবস্থা), আল্লাহ তার চেয়ে অসীম গুণে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তবু মানুষ সেই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে ছেড়ে নিজেদের বানানো জিনিসের পূজা করে এটাই শিরকের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।

"اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ" (১২৬)
"'আল্লাহ্ই তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব।'"

ইলিয়াস (আ.) তাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তাদের ইতিহাসের কথা। তাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.), ইয়াকুব (আ.) সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করতেন। বালের পূজা তাদের ঐতিহ্য নয়; এটি একটি বিচ্যুতি, একটি বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব। ইলিয়াস (আ.) তাদের মূল শেকড়ের দিকে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

"فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ" (১২৭)
"কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল; সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই (জাহান্নামে) হাজির করা হবে।"

জনগণের প্রতিক্রিয়া ছিল প্রত্যাখ্যান। তারা ইলিয়াস (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলল। আল্লাহ তাআলা এখানে তাদের পরিণতির কথাও জানিয়ে দিলেন তাদেরকে জাহান্নামে হাজির করা হবে। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে।

"إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ" (১২৮)
"শুধু আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।"

অর্থাৎ, যারা ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছিল এবং খাঁটি মনে এক আল্লাহর ইবাদতে ফিরে এসেছিল, তারা এই শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে।

"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ" (১২৯)
"আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুনাম) রেখে দিয়েছি।"

"سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ" (১৩০)
"ইলিয়াসের প্রতি সালাম।"

এই আয়াত দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সুনাম ও প্রশংসা রেখে দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম সবাই ইলিয়াস (আ.)-কে শ্রদ্ধা করে। ইহুদিরা বিশ্বাস করে, ইলিয়াস (আ.) আবার ফিরে আসবেন মসীহের আগমনবার্তা নিয়ে। মুসলিমরা তাঁকে একজন মহান নবী হিসেবে বিশ্বাস করে এবং সম্মান করে। আল্লাহ নিজে তাঁকে সালাম পেশ করেছেন এটি তাঁর মর্যাদার চূড়ান্ত প্রমাণ।

"إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ" (১৩১)
"নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে থাকি।"

"إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ" (১৩২)
"নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"

এই আয়াতগুলো থেকে আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা পাই। তিনি ছিলেন:
১. প্রেরিত রাসূলদের একজন।
২. সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।
৩. আল্লাহর একনিষ্ঠ মুমিন বান্দা।
৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে সালামপ্রাপ্ত।
৫. পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুনাম ও প্রশংসার পাত্র।

এত উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও তিনি যে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দারাও দুনিয়াতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন।

বাইবেলীয় বর্ণনা (১ রাজাবলি ১৭) ও ইসলামী ইতিহাসের সংযোগ

ইসলামী তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (বিশেষ করে ১ রাজাবলি ১৭-১৯ অধ্যায় এবং ২ রাজাবলি ১-২ অধ্যায়) বর্ণনার অনেকাংশেই মিল রয়েছে। তবে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা বাইবেলের বর্ণনাকে চূড়ান্ত সত্য হিসেবে গ্রহণ করি না; বরং কোরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তা যাচাই করি। যে অংশগুলো কোরআনের মূল শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং যে অংশগুলোতে নবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, সেগুলোকে আমরা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে বিবেচনা করতে পারি।

বাইবেলের ১ রাজাবলি ১৭ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে: "গিলিয়দের তিশবীবাসী ইলিয়াস আহাবকে বললেন, 'জীবিত সদাপ্রভু ইসরাইলের ঈশ্বরের দিব্য, যাঁর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আগামী বছরগুলোতে শিশির বা বৃষ্টি কিছুই পড়বে না, শুধু আমার কথাতেই পড়বে।' তারপর সদাপ্রভুর বাক্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও, পূর্ব দিকে মুখ করে কেরীৎ নদীর তীরে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তুমি সেই নদীর পানি পান করবে এবং আমি কাকদের আদেশ দিয়েছি তারা যেন তোমাকে সেখানে খাবার দেয়।' সে সদাপ্রভুর বাক্য অনুসারে গিয়ে কেরীৎ নদীর তীরে বাস করতে লাগল, যা জর্ডান নদীর পূর্বে। কাকেরা সকালে তাঁর জন্য রুটি ও মাংস এবং সন্ধ্যায় রুটি ও মাংস নিয়ে আসত, আর তিনি নদীর পানি পান করতেন। কিছুদিন পর সেই নদী শুকিয়ে গেল, কারণ দেশে বৃষ্টি হচ্ছিল না।"

এই বর্ণনার সাথে ইসলামী ইতিহাসের সংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে তাফসীরকারগণ বলেন, ইলিয়াস (আ.) একজন নবী ছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে অলৌকিকভাবে রিজিক দিয়েছিলেন। কাকের মাধ্যমে খাবার পাঠানো ছিল আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। এটি প্রমাণ করে, আল্লাহ যখন চান, তখন অসম্ভব মাধ্যমেও রিজিক পৌঁছে দিতে পারেন।

ইসলামী ইতিহাসবিদ ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: "ইলিয়াস (আ.)-কে বনী ইসরাইলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যখন তারা বাল নামক মূর্তির পূজা করত। তিনি তাদের এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেন এবং বালপূজা থেকে বিরত থাকতে বলেন। কিন্তু তারা তাঁর কথা মানেনি। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন এবং আল্লাহ সাড়ে তিন বছর তাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ করে দেন।"

এখানে উল্লেখ্য, ইসলামী ইতিহাসে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার সময়কাল নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে। কেউ বলেন তিন বছর, কেউ বলেন সাড়ে তিন বছর। তবে বাইবেলের বর্ণনায় স্পষ্টভাবে সাড়ে তিন বছরের কথা বলা হয়েছে (লূক ৪:২৫, যাকোব ৫:১৭)।

ইসলামী তাফসীরে ইলিয়াস (আ.)-এর নামের উচ্চারণ নিয়েও সামান্য মতভেদ আছে। কোরআনে এসেছে 'ইলিয়াস' (إِلْيَاس) এবং 'ইল-ইয়াসীন' (إِلْ يَاسِين)। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, 'ইল-ইয়াসীন' হলো ইলিয়াস (আ.)-এরই আরেকটি নাম, যেমন 'ইসমাঈল' ও 'ইসমাঈন'। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, "ইলিয়াস ও ইল-ইয়াসীন একই ব্যক্তি। আরবদের রীতি হলো, তারা অনেক সময় নামের শেষে 'নূন' অক্ষর যোগ করে, যেমন ইসমাঈলকে ইসমাঈন, ইদ্রিসকে ইদ্রিসীন বলে।"

রাজপ্রাসাদে সত্য উচ্চারণের সাহস: "আগামী বছরগুলোতে বৃষ্টি হবে না"

ইলিয়াস (আ.)-এর আবির্ভাব ছিল আকস্মিক এবং নাটকীয়। তিনি কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই, কোনো পরিচিতি ছাড়াই সরাসরি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সেই সময় রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। বিশেষ করে একজন সাধারণ মানুষের জন্য রাজার সামনে দাঁড়ানো ছিল প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁর অন্তরে ছিল সত্যের জোর, আর তাঁর জবানে ছিল আল্লাহর কালামের ধার।

তিনি রাজা আহাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোনো রকম ভণিতা বা চাটুকারিতা ছাড়াই সরাসরি ঘোষণা করলেন: **"জীবিত সদাপ্রভু ইসরাইলের ঈশ্বরের দিব্য, যাঁর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আগামী বছরগুলোতে শিশির বা বৃষ্টি কিছুই পড়বে না, শুধু আমার কথাতেই পড়বে।"** (১ রাজাবলি ১৭:১)।

এই একটি মাত্র বাক্য বিশ্লেষণ করলে আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর চরিত্রের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পাই:

১. আল্লাহর জীবন্ত সত্তার প্রতি অটল বিশ্বাস:
ইলিয়াস (আ.) বললেন, "জীবিত সদাপ্রভু ইসরাইলের ঈশ্বরের দিব্য।" বাল ছিল মৃত পাথরের মূর্তি। তার কোনো জীবন নেই, কোনো শক্তি নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ হলেন **হাইয়্যুন** (চিরঞ্জীব), যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না এবং যাঁর হাতে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। ইলিয়াস (আ.) এই বাক্যের মাধ্যমে বালের অসারতা ও আল্লাহর মহত্ত্বকে একই সাথে তুলে ধরলেন।

২. আত্মপরিচয়ের স্পষ্টতা:

"যাঁর সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি" এই অংশটুকু ইলিয়াস (আ.)-এর আত্মপরিচয় স্পষ্ট করে। তিনি রাজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বটে, কিন্তু তিনি আসলে কারও দাস নন; তিনি আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান। এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান। যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক মজবুত, তার কাছে দুনিয়ার কোনো রাজা-বাদশাহর ভয় থাকে না।

৩. চ্যালেঞ্জের সরাসরি উচ্চারণ:

"আগামী বছরগুলোতে শিশির বা বৃষ্টি কিছুই পড়বে না, শুধু আমার কথাতেই পড়বে।" এটি ছিল বালের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত। যেহেতু মানুষ বালকে বৃষ্টির দেবতা মনে করত, ইলিয়াস (আ.) ঘোষণা করলেন, বৃষ্টি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে। আর যেহেতু তারা বালের পূজা করে আল্লাহকে ভুলে গেছে, তাই আল্লাহ তাদের ওপর থেকে বৃষ্টির রহমত উঠিয়ে নেবেন। আর এই রহমত ফিরিয়ে আনার চাবিকাঠি আল্লাহ ইলিয়াস (আ.)-এর হাতে দিয়েছেন। অর্থাৎ, যতদিন না ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর হুকুমে আবার বৃষ্টির জন্য দোয়া করবেন, ততদিন বৃষ্টি হবে না।

এই ঘোষণা ছিল রাজা আহাবের জন্য এক বিরাট ধাক্কা। আহাব হয়তো ভেবেছিলেন, ইলিয়াসকে হত্যা করলেই সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) তাকে বুঝিয়ে দিলেন, বৃষ্টি বন্ধ করার ক্ষমতা ইলিয়াসের নিজের নয়; এটি আল্লাহর কাজ। ইলিয়াসকে হত্যা করলে বৃষ্টি আসবে না, বরং আল্লাহর ক্রোধ আরও বাড়বে। অন্যদিকে, ইলিয়াস (আ.) বেঁচে থাকলে এবং তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই কেবল বৃষ্টি ফিরে আসতে পারে। এভাবে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে একটি বিশেষ নিরাপত্তা বলয় প্রদান করলেন।

ঘোষণা দিয়েই ইলিয়াস (আ.) রাজপ্রাসাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাইবেলের ভাষায়, "সদাপ্রভুর বাক্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও...'" অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁকে আত্মগোপনের নির্দেশ দিলেন। কারণ ইজেবেলের মতো একজন ধর্মান্ধ রানি ইলিয়াস (আ.)-কে হত্যা করার জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন, খরার ভয়াবহতা দিয়ে পুরো জাতিকে শিক্ষা দিতে এবং পরবর্তীতে কারমেল পাহাড়ে মিথ্যা ও সত্যের চূড়ান্ত ফয়সালা করতে।

ঐতিহাসিক ও তাফসীরগত বিশ্লেষণ:

ইমাম কুরতুবি (রহ.) তাঁর তাফসীরে বলেন, ইলিয়াস (আ.)-এর এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব দান করেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে নবী সত্য এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান। ইলিয়াস (আ.)-এর মুখ থেকে উচ্চারিত বাক্যটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি, যা তিনি বিনা দ্বিধায় প্রচার করেছিলেন। এখানে সাহসের যে দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করেছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুমিনের জন্য অনুসরণীয়।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:

আজকের যুগে আমরা হয়তো রাজা আহাবের মতো প্রকাশ্য অত্যাচারী শাসকের মুখোমুখি নাও হতে পারি, কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই, যেখানে সত্য বলাটা কঠিন। কর্মক্ষেত্রে যখন দেখি অন্যায় হচ্ছে, সমাজে যখন দেখি কুসংস্কার ও শিরকী কাজকর্ম প্রচলিত, তখন আমরা কি ইলিয়াস (আ.)-এর মতো সাহসী হতে পারি? আমরা কি দ্বীনের সত্য কথাটা বলতে পারি, যদিও তাতে আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে? ইলিয়াস (আ.)-এর শিক্ষা হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সত্য উচ্চারণ করলে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার জন্য এমন পথ তৈরি করে দেন, যা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৬-এর শেষে):

১. ইলিয়াস (আ.)-এর মতো কি আমার অন্তরে সত্য বলার সাহস আছে? আমি কি সেই সাহস চর্চা করি?

২. আমি কি বুঝতে পারি যে, আমার রিজিক ও জীবনের সকল ব্যবস্থা একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোনো মাধ্যম বা সিস্টেমের হাতে নয়?

৩. আজকের দিনে আমার জন্য "বালের প্রাসাদে প্রবেশ করে সত্য বলা" বলতে কী বোঝায়? (যেমন: হারাম অফিসে হালাল কাজের জন্য দাঁড়ানো, পারিবারিক অন্যায়ের প্রতিবাদ করা)।

অধ্যায় ৭: সাড়ে তিন বছরের খরার ঘটনাবহুল দিনগুলি

ইলিয়াস (আ.)-এর রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর উত্তর ইসরাইলের আকাশ থেকে যেন রহমতের সকল দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বৃষ্টি নামার ঋতু এলো, কিন্তু আকাশে মেঘের দেখা মিলল না। ফসলের মাঠ ফেটে চৌচির হতে লাগল। নদী-নালা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। যে জাতি বালকে বৃষ্টির দেবতা মানত, তারা দিনের পর দিন বালের মন্দিরে কান্নাকাটি করল, কিন্তু আকাশ থেকে এক ফোঁটা পানি পড়ল না। এই অধ্যায়ে আমরা সেই ভয়াবহ সাড়ে তিন বছরের খরার দিনগুলোতে ইলিয়াস (আ.)-এর গোপন জীবন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অলৌকিক রিজিকের ব্যবস্থা, জাতির উপর নেমে আসা দুর্ভিক্ষ এবং বালের পুরোহিতদের অসহায়ত্বের বিস্তারিত বিবরণ জানব।

নবীর গোপন জীবন ও অলৌকিক রিজিক (কেরীৎ উপত্যকা ও সারিফত বিধবার ঘটনা)

রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার পর আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন জর্ডান নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত **কেরীৎ (Kerith)** নামক একটি ছোট নদীর তীরে গিয়ে আত্মগোপন করতে। এটি একটি নির্জন উপত্যকা ছিল, যেখানে মানুষের বসতি ছিল না। সেখানে ইলিয়াস (আ.) একাকী দিন কাটাতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রিজিকের জন্য এক অভিনব ব্যবস্থা করলেন। তিনি কাকদের আদেশ দিলেন, তারা যেন প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য রুটি ও মাংস নিয়ে আসে। আর তিনি কেরীৎ নদীর পানি পান করতেন। (১ রাজাবলি ১৭:২-৬)।

এই ঘটনাটি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। প্রথমত, এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে রক্ষা করতে চান, তখন তিনি অসম্ভব মাধ্যমকেও সম্ভব করে তোলেন। কাক সাধারণত খাবার চুরি করে খায় এবং নিজের পেট ভরার জন্যই ব্যস্ত থাকে। কিন্তু আল্লাহর হুকুমে সেই কাকই হয়ে গেল নবীর খাদিম, যে নিয়মিত হালাল ও পবিত্র খাবার নিয়ে আসত। দ্বিতীয়ত, এই ঘটনা ইলিয়াস (আ.)-এর ঈমানকে আরও মজবুত করেছিল। নির্জন উপত্যকায় বসে প্রতিদিন অলৌকিকভাবে রিজিক আসতে দেখলে একজন মুমিনের আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল কত দৃঢ় হয়, তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু কিছুদিন পর দেশব্যাপী খরার কারণে কেরীৎ নদীটিও শুকিয়ে গেল। তখন আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে দ্বিতীয় নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, "ওঠো, সীদোনের সারিফতে (Zarephath) যাও এবং সেখানে বাস করো। দেখো, আমি সেখানকার এক বিধবা নারীকে তোমার খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ দিয়েছি।" (১ রাজাবলি ১৭:৯)।

এখানে লক্ষণীয়, সারিফত ছিল ফিনিশীয় অঞ্চলের একটি শহর, যা ছিল ইজেবেলের পিতার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ, ইলিয়াস (আ.)-কে শত্রু রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রস্থলে পাঠানো হলো। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল বিস্ময়কর।

ইলিয়াস (আ.) যখন সারিফতের প্রবেশপথে পৌঁছালেন, তখন তিনি দেখলেন এক বিধবা নারী কাঠ কুড়াচ্ছেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "দয়া করে একটু পানি নিয়ে এসো, আমি পান করি।" মহিলাটি পানি আনতে যেতেই তিনি আবার ডেকে বললেন, "দয়া করে একটু রুটিও নিয়ে এসো।" তখন মহিলাটি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উত্তর দিলেন: "জীবিত সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বরের দিব্য, আমার কাছে কোনো রুটি নেই, শুধু একটি কলসিতে এক মুঠো আটা এবং একটি কুপ্পিতে সামান্য তেল আছে। দেখো, আমি এই দুটি কাঠকুটা কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি, যাতে গিয়ে নিজের জন্য ও আমার ছেলের জন্য তা রান্না করতে পারি। আমরা তা খেয়ে নেব, তারপর মারা যাব।" (১ রাজাবলি ১৭:১২)।

মহিলাটির এই উত্তর শুনলে যে কারও চোখে পানি আসবে। খরার কারণে তার অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে, তার কাছে শেষ খাবারের উপকরণটুকু আছে, আর সেটা খেয়ে সে ও তার সন্তান মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করবে। ঠিক এমন সময় ইলিয়াস (আ.) তাকে একটি অবিশ্বাস্য প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, "ভয় পেও না। যাও, তুমি যেমন বলেছ তেমন করো। তবে আগে আমার জন্য একটি ছোট রুটি বানিয়ে নিয়ে এসো, তারপর তোমার ও তোমার ছেলের জন্য বানিয়ো। কারণ ইসরাইলের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা বলছেন: 'যতদিন না সদাপ্রভু পৃথিবীতে বৃষ্টি না দেন, ততদিন ওই কলসির আটা শেষ হবে না এবং কুপ্পির তেল ফুরিয়ে যাবে না।'" (১ রাজাবলি ১৭:১৩-১৪)।

এটি ছিল তাওয়াক্কুলের এক চরম পরীক্ষা। একজন ক্ষুধার্ত মা, যার সন্তান মৃত্যুর প্রহর গুনছে, তার কাছে শেষ খাবারটুকু প্রথমে একজন অপরিচিত লোককে দিতে বলা হচ্ছে, এবং তার বিনিময়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ অলৌকিকভাবে তার আটা ও তেলের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখবেন। মহিলাটি ইলিয়াস (আ.)-এর কথা বিশ্বাস করলেন এবং সেভাবেই কাজ করলেন। আর সত্যিই,

বাইবেলের ভাষায়, "সদাপ্রভুর যে বাক্য তিনি ইলিয়াসের মাধ্যমে বলেছিলেন, সেই অনুসারে কলসির আটা শেষ হলো না এবং কুপ্পির তেল ফুরিয়ে গেল না।" (১ রাজাবলি ১৭:১৬)।

এই ঘটনার কিছুদিন পর সেই বিধবার পুত্র গুরুতর অসুস্থ হয়ে মারা গেল। মহিলাটি ইলিয়াস (আ.)-কে দোষারোপ করে বললেন, "হে ঈশ্বরের লোক, তুমি কি আমার পাপ স্মরণ করিয়ে দিতে এবং আমার ছেলের প্রাণ নিতে আমার কাছে এসেছ?" ইলিয়াস (আ.) তখন শিশুটিকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, তার ওপর তিনবার শুয়ে পড়লেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: "হে সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর, এই বিধবার ছেলেটির প্রাণ তুমি তার মধ্যে ফিরিয়ে দাও।" আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং শিশুটি জীবিত হয়ে উঠল। ইলিয়াস (আ.) শিশুটিকে তার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে বললেন, "দেখো, তোমার ছেলে জীবিত।" তখন সেই মহিলা বললেন, "এখন আমি জানলাম যে, তুমি সত্যিই ঈশ্বরের লোক এবং সদাপ্রভুর বাক্য তোমার মুখে সত্য।" (১ রাজাবলি ১৭:১৭-২৪)।

ইসলামী তাফসীরে এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, "এটি ছিল ইলিয়াস (আ.)-এর অন্যতম বড় মুজিজা। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাধ্যমে মৃতকে জীবিত করেছিলেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, যিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন, তিনিই বৃষ্টি দিতে পারেন এবং তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য।"

এই ঘটনার শিক্ষা ও সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:
কেরীৎ উপত্যকা ও সারিফত বিধবার ঘটনা আমাদের রিজিকের মালিকানা সম্পর্কে একটি মৌলিক শিক্ষা দেয়। আল্লাহ তাআলা চাইলে অসম্ভব মাধ্যমেও রিজিক পৌঁছে দিতে পারেন (যেমন কাকের মাধ্যমে)। আবার তিনি চাইলে সামান্য উপকরণেও বরকত দিতে পারেন, যা যুগের পর যুগ শেষ হয় না (যেমন বিধবার আটা-তেল)। আজকের দুনিয়ায় আমরা ব্যাংক ব্যালেন্স, চাকরির স্থায়িত্ব এবং বাজার অর্থনীতির ওপর এত বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি যে, আমরা ভুলেই গেছি, আসল রিজিকদাতা আল্লাহ। ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি এমন জায়গা থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

জাতির উপর নেমে আসা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের বিবরণ: রাজপ্রাসাদেও খাদ্যের হাহাকার

এদিকে উত্তর ইসরাইলে খরার তীব্রতা দিন দিন বাড়তে লাগল। প্রথম বছর আকাশে মেঘ দেখা গেল না, ফসল হলো না। দ্বিতীয় বছর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হলো। গবাদি পশু মারা যেতে লাগল। নদী-নালা শুকিয়ে গেল। তৃতীয় বছরে এসে অবস্থা চরম আকার ধারণ করল। যে ভূমি একসময় দুধ-মধুর প্রবাহীভূমি ছিল, তা পরিণত হলো মরুভূমিতে। মানুষ খাবারের অভাবে মরতে লাগল। রাজপ্রাসাদেও খাদ্যের হাহাকার দেখা দিল।

বাইবেলের ১ রাজাবলি ১৮ অধ্যায়ে এই দুর্ভিক্ষের একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ পাওয়া যায়। রাজা আহাব তাঁর প্রাসাদ তত্ত্বাবধায়ক ওবদিয়াকে ডেকে বললেন, "দেশের সমস্ত জলপ্রবাহ ও নদীর ধারে ধারে যাও, হয়তো আমরা ঘাস খুঁজে পাব, যাতে ঘোড়া ও খচ্চরগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারি এবং কিছু পশুও হারাতে না হয়।" (১ রাজাবলি ১৮:৫)। একজন রাজা, যার সাম্রাজ্যে ধন-সম্পদের অভাব ছিল না, তিনিও এখন তার পশুদের জন্য ঘাস খুঁজে বেড়াচ্ছেন! এটি ছিল আল্লাহর ক্রোধের এক জীবন্ত নিদর্শন।

এই দুর্ভিক্ষের সময় রাজা আহাব ও রানি ইজেবেল তাদের ভুল স্বীকার করেননি; বরং তারা ইলিয়াস (আ.)-এর ওপর আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল, ইলিয়াসই এই খরার কারণ। তারা ইলিয়াসকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে চেয়েছিল। ইজেবেল বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন নবীদের হত্যার কাজে। বাইবেলের ভাষায়, "ইজেবেল যখন সদাপ্রভুর নবীদের হত্যা করছিলেন, তখন ওবদিয়া একশোজন নবীকে নিয়ে দুটি গুহায় পঞ্চাশ জন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং রুটি ও পানি দিয়ে তাঁদের প্রতিপালন করেছিলেন।" (১ রাজাবলি ১৮:৪)।

ওবদিয়া ছিলেন রাজার প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু অন্তরে তিনি ছিলেন একজন খোদাভীরু মুমিন। তিনি গোপনে আল্লাহর নবীদের সেবা করতেন। ইতিহাসের এই চরিত্রটি আমাদের শেখায়, অত্যাচারী শাসকের দরবারেও আল্লাহর খাঁটি বান্দা থাকতে পারেন, যারা নিজেদের অবস্থান থেকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করেন। ওবদিয়া প্রকাশ্যে ইজেবেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, কিন্তু তিনি যা করতে পেরেছেন, তাই করেছেন আল্লাহর নবীদের জীবন রক্ষা করেছেন।

বালের পুরোহিতদের অসহায়ত্ব: মূর্তির সামনে কান্না করেও বৃষ্টি না পাওয়া

দুর্ভিক্ষের এই দীর্ঘ সময়ে বালের পুরোহিতরা কী করছিল? তারা তাদের দেবতার কাছে বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটি করছিল, প্রার্থনা করছিল, এমনকি নিজেদের শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করে রক্ত ঝরাচ্ছিল কিন্তু কোনো ফল হচ্ছিল না। আকাশ ছিল নিথর, নিস্পৃহ। যে বালকে তারা মেঘের আরোহী ও বৃষ্টির মালিক বলত, সেই বাল তাদের এক ফোঁটা পানি দিতে পারল না।

এই পরিস্থিতি বালপূজার অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু শিরকে লিপ্ত মানুষের মন এতটাই বদ্ধ হয়ে যায় যে, তারা চোখের সামনে প্রমাণ দেখেও সত্য মানতে চায় না। তারা ভাবতে লাগল, হয়তো ইলিয়াসের জাদু বা অভিশাপের কারণেই বাল তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। তারা কখনো ভাবল না যে, বাল নামের কোনো সত্তার অস্তিত্বই নেই, এবং যার অস্তিত্ব নেই, সে কীভাবে বৃষ্টি দেবে?

ইতিহাসবিদ ও ধর্মতাত্ত্বিকরা বলেন, প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার যে আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল দেবতার মনোরঞ্জনের জন্য নিজেদের শরীর কেটে রক্তপাত করা। উগারিতের প্রাচীন ফলকগুলোতে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। বালের পুরোহিতরা বিশ্বাস করত, তাদের রক্ত দেখে বাল দেবতা করুণার্দ্র হবেন এবং বৃষ্টি দেবেন। কিন্তু এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান ছিল শয়তানের ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করেই আকাশের সমস্ত দরজা বন্ধ রেখেছিলেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, বাল কিছুই করতে পারে না।

এই সময়কালটি ছিল ইসরাইল জাতির জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহ তাআলা চাচ্ছিলেন, তারা যেন তাদের ভুল বুঝতে পারে এবং এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে, অধিকাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের কষ্ট সহ্য করেও তাদের পাপের পথ থেকে ফিরে আসেনি। তারা বরং ইলিয়াস (আ.)-এর প্রতিই আরও ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

তাফসীরগত বিশ্লেষণ:
ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন, এই খরা ছিল বনী ইসরাইলের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সতর্কবার্তা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি তাদের বিপদ-আপদ দিয়ে পাকড়াও করি, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা সাজদা: ২১)। কিন্তু তারা ফিরে আসেনি। তখন আল্লাহ তাআলা চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য কারমেল পাহাড়ের ঘটনা নির্ধারণ করেছিলেন।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৭-এর শেষে):
১. আমি কি আমার জীবনের 'খরা' বা কষ্টের সময় আল্লাহর দিকে ফিরে যাই, নাকি দুনিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমের কাছে ছুটে যাই?
২. সারিফতের বিধবার মতো কি আমার মধ্যে 'শেষ সম্বলটুকু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার' মানসিকতা আছে?
৩. ওবদিয়ার মতো কি আমি আমার অবস্থান থেকে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করার চেষ্টা করি, যদিও পরিস্থিতি প্রতিকূল?

অধ্যায় ৮: কারমেল পর্বতের মহামহোৎসব – চূড়ান্ত ফয়সালা

খরার তৃতীয় বছর পূর্ণ হতে চলল। দেশের অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। মানুষ ও পশুপাখি মরছে। ঠিক এই সময় আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে নির্দেশ দিলেন: "যাও, আহাবের সামনে উপস্থিত হও, আর আমি পৃথিবীতে বৃষ্টি দেব।" (১ রাজাবলি ১৮:১)। ইলিয়াস (আ.) আর গোপনে থাকলেন না। তিনি প্রকাশ্যে রাজধানী শমরিয়ার দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তাঁর সাথে ওবদিয়ার সাক্ষাৎ হলো। ওবদিয়া ইলিয়াস (আ.)-কে দেখে ভয়ে সেজদায় পড়ে গেলেন এবং বললেন, "হে আমার প্রভু ইলিয়াস, তুমি কি সত্যিই সেই?" ইলিয়াস (আ.) বললেন, "হ্যাঁ, যাও তোমার প্রভুকে গিয়ে বলো, ইলিয়াস এখানে এসেছে।" ওবদিয়া প্রথমে ভয় পেলেন, কারণ তিনি জানতেন, আহাব ইলিয়াসকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর নামে শপথ করে বললেন, "আজই আমি আহাবের সামনে উপস্থিত হব।" (১ রাজাবলি ১৮:২-১৫)।

রাজা আহাব ইলিয়াসের আগমনের সংবাদ পেয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন। আহাব ইলিয়াসকে দেখেই বললেন, "হে ইসরাইলের বিপর্যয়কারী, তুমিই কি সেই?" ইলিয়াস (আ.) বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে জবাব দিলেন, "আমি ইসরাইলের বিপর্যয় ঘটাইনি; বরং তুমি এবং তোমার পিতার পরিবারই ঘটিয়েছ, কারণ তোমরা সদাপ্রভুর আদেশ অমান্য করেছ এবং বাল দেবতার অনুসরণ করেছ।" (১ রাজাবলি ১৮:১৭-১৮)। এরপর ইলিয়াস (আ.) আহাবকে চ্যালেঞ্জ জানালেন: "এখন তুমি সমগ্র ইসরাইলকে কারমেল পর্বতে আমার কাছে জড়ো করো, আর সেখানে বালের ৪৫০ জন পুরোহিত এবং আশেরার ৪০০ জন পুরোহিতকেও নিয়ে এসো, যারা ইজেবেলের তত্ত্বাবধানে খায়।" (১ রাজাবলি ১৮:১৯)।

এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় ও ঈমান-জাগানিয়া এক ঘটনার কারমেল পর্বতের মহাচ্যালেঞ্জ।

কেন কারমেল? বালের নিজস্ব ভূমিতে চ্যালেঞ্জ

কারমেল পর্বত (Mount Carmel) কেন বেছে নেওয়া হয়েছিল? এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কারমেল পর্বত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি সুউচ্চ পর্বতমালা, যা বর্তমান ইসরাইলের হাইফা শহরের কাছে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এই পর্বতটি ছিল অত্যন্ত উর্বর ও সবুজ-শ্যামল, যার নামের অর্থই হলো "ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্র" বা "ফলবান উদ্যান"। কানানীয় ধর্মে এই পর্বতটিকে বাল দেবতার অন্যতম প্রধান আবাসস্থল হিসেবে গণ্য করা হতো। কানানীয়রা বিশ্বাস করত, বাল এই পর্বতের চূড়ায় বসবাস করেন এবং এখান থেকেই তিনি মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করেন।

ইলিয়াস (আ.) ইচ্ছে করেই বালের এই পবিত্রতম স্থানটিকেই চ্যালেঞ্জের মঞ্চ হিসেবে বেছে নিলেন। এর পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, বালের নিজের ভূমিতেও বালের কোনো কর্তৃত্ব নেই। আল্লাহর ক্ষমতা সর্বত্র, এমনকি যেখানে বালের উপাসনা সবচেয়ে জোরালো, সেখানেও। দ্বিতীয়ত, কারমেল পর্বত ছিল উত্তর ইসরাইলের একটি সুপরিচিত ও সহজে দৃশ্যমান স্থান, যেখানে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হতে পারত এবং ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারত। তৃতীয়ত, এই পর্বতের চূড়া থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে তাকানো যেত, যা পরবর্তীতে বৃষ্টির আগমনের সংবাদ দেখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

তথ্যসূত্র ও প্রত্নতত্ত্ব: আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে কারমেল পর্বতে প্রাচীন বাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে কানানীয় ও পরবর্তী ফিনিশীয়দের ধর্মীয় স্থাপনার নিদর্শন মেলে। এটি প্রমাণ করে যে, ইলিয়াস (আ.)-এর সময়ে এই পর্বত সত্যিই বালপূজার একটি কেন্দ্র ছিল।

৪৫০ বনাম ১: একার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের শক্তি

রাজা আহাবের নির্দেশে সমগ্র ইসরাইল থেকে লোকজন জড়ো হতে লাগল কারমেল পর্বতে। বালের ৪৫০ জন পুরোহিত তাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে সজ্জিত হয়ে উপস্থিত হলো। (আশেরার ৪০০ পুরোহিতের কথা পরে আর উল্লেখ নেই, সম্ভবত তারা আসেনি অথবা ঘটনায় অংশ নেয়নি।) তাদের পেছনে ছিল রাজার সমর্থন, রানির পৃষ্ঠপোষকতা এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পুরো যন্ত্র। অন্যদিকে, ইলিয়াস (আ.) একা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সাথে কোনো সৈন্য নেই, কোনো অনুচর নেই, শুধু তাঁর পরনে মোটা পশমের চাদর এবং অন্তরে আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস।

জনতা যখন জড়ো হলো, তখন ইলিয়াস (আ.) তাদের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মর্মস্পর্শী প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন। বাইবেলের ভাষায়: **"তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি সদাপ্রভুই ঈশ্বর হন, তবে তাঁর অনুসরণ করো; আর যদি বাল হয়, তবে তার অনুসরণ করো।"** (১ রাজাবলি ১৮:২১)। ইলিয়াস (আ.)-এর এই প্রশ্নটি শুধু তখনকার ইসরাইলিদের জন্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য এক চিরন্তন প্রশ্ন। যারা দ্বিধাগ্রস্ত, যারা একই সাথে আল্লাহ ও দুনিয়ার মূর্তিগুলোর পূজা করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন: "আর কতকাল তোমরা দ্বিধায় ভুগবে? সিদ্ধান্ত নাও!"

জনতা নীরব রইল। কেউ একটি কথাও বলল না। তারা যেন বুঝতে পারছিল না, কী বলা উচিত। তখন ইলিয়াস (আ.) চ্যালেঞ্জের নিয়ম বাতলে দিলেন: "আমি সদাপ্রভুর নবী, একমাত্র আমিই বেঁচে আছি; আর বালের পুরোহিতরা আছে ৪৫০ জন। আমাদের দুটি ষাঁড় দেওয়া হোক। তারা একটি বেছে নিয়ে তাকে টুকরো টুকরো করে কাটুক এবং কাঠের ওপর রাখুক, কিন্তু আগুন জ্বালাবে না। আমিও অন্যটি কেটে কাঠের ওপর রাখব, আগুন জ্বালাব না। তারপর তোমরা তোমাদের দেবতার নামে ডাকো, আর আমি সদাপ্রভুর নামে ডাকব। যে ঈশ্বর আগুনের মাধ্যমে উত্তর দেবেন, তিনিই সত্য ঈশ্বর।" (১ রাজাবলি ১৮:২২-২৪)।

জনতা একবাক্যে এই প্রস্তাব মেনে নিল। ইলিয়াস (আ.) বালের পুরোহিতদের আগে সুযোগ দিলেন, কারণ তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল।

পানি ঢালার রহস্য: সন্দেহাতীতভাবে অলৌকিকত্ব প্রমাণের কৌশল

বালের পুরোহিতরা তাদের বেছে নেওয়া ষাঁড়টিকে কেটে বেদীর ওপর রাখল। তারপর শুরু হলো তাদের প্রার্থনা। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত তারা বালের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগল: "হে বাল, আমাদের উত্তর দাও!" কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। আকাশ থেকে কোনো আগুন পড়ল না। তারা বেদীর চারপাশে নাচতে লাগল, লাফাতে লাগল। দুপুর গড়িয়ে গেল, কিছুই হলো না।

তখন ইলিয়াস (আ.) তাদের উপহাস করতে শুরু করলেন। বাইবেলের ভাষায়: "তোমরা আরও জোরে ডাকো! কারণ সে তো দেবতা! হয়তো সে ধ্যানমগ্ন, অথবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে, কিংবা সফরে গেছে, অথবা ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই তাকে জাগাতে হবে!" (১ রাজাবলি ১৮:২৭)। এই উপহাসের পেছনে ছিল একটি গভীর শিক্ষা। ইলিয়াস (আ.) বোঝাতে চাইলেন, যিনি সত্যিকারের ঈশ্বর,

তিনি কখনো ঘুমান না, কখনো অমনোযোগী হন না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন: **"لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ"** – "তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।" (সূরা বাকারা: ২৫৫)।

ইলিয়াসের উপহাসে উত্তেজিত হয়ে বালের পুরোহিতরা আরও উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা তাদের প্রথা অনুযায়ী তলোয়ার ও বল্লম দিয়ে নিজেদের শরীর কাটতে লাগল, যতক্ষণ না রক্ত গড়িয়ে পড়ে। তারা বিকাল পর্যন্ত চিৎকার করল, কিন্তু কোনো সাড়া পেল না। কোনো আগুন আসল না, কোনো বাণী এলো না। বাইবেলের ভাষায়: "কিন্তু কোনো রব শোনা গেল না; কেউ উত্তর দিল না, কেউ মনোযোগ দিল না।" (১ রাজাবলি ১৮:২৯)।

এবার ইলিয়াস (আ.)-এর পালা। তিনি জনতাকে বললেন, "তোমরা আমার কাছে এসো।" সবাই তাঁর কাছে এলে তিনি প্রথমেই ভেঙে ফেলা সদাপ্রভুর বেদীটি পুনর্নির্মাণ করলেন। তিনি বনী ইসরাইলের বারোটি গোত্রের প্রতীক হিসেবে বারোটি পাথর নিয়ে একটি বেদী তৈরি করলেন। তারপর বেদীর চারপাশে একটি বড় গর্ত খুঁড়লেন। কুরবানির পশুটিকে কেটে কাঠের ওপর সাজিয়ে রাখলেন।

এরপর তিনি এমন একটি কাজ করলেন, যা দেখে সবাই হতবাক হয়ে গেল। তিনি বললেন, "চারটি বড় কলসি ভরে পানি নিয়ে এসো এবং সেই পানি কুরবানি ও কাঠের ওপর ঢেলে দাও।" তারা তাই করল। তিনি বললেন, "দ্বিতীয়বার ঢালো।" তারা আবার ঢালল। তিনি বললেন, "তৃতীয়বার ঢালো।" তারা তৃতীয়বারও ঢালল। এত পানি ঢালা হলো যে, পানি বেদী থেকে গড়িয়ে চারপাশের গর্তটি ভরে গেল। (১ রাজাবলি ১৮:৩০-৩৫)।

ইলিয়াস (আ.) কেন এটা করলেন? এটা ছিল তার দূরদর্শিতার চূড়ান্ত প্রমাণ। তিনি জানতেন, শয়তানের অনুসারীরা সবসময় সন্দেহের বীজ বপন করতে চায়। যদি তিনি শুকনো কাঠে আগুন পড়ার জন্য দোয়া করতেন, তাহলে কেউ বলতে পারত, "কাঠের ভেতর হয়তো আগুন লুকানো ছিল।" কিন্তু তিনি যখন পানিতে ভেজা কাঠের ওপর আগুন চাইলেন, তখন কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এটি হতে পারে একমাত্র আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার ফলেই।

ইলিয়াস (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত অথচ আত্মবিশ্বাসী দোয়া

সবকিছু প্রস্তুত হলে ইলিয়াস (আ.) বেদীর সামনে দাঁড়ালেন। তখন ছিল সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়, যে সময়ে সাধারণত সন্ধ্যার কুরবানি পেশ করা হতো। ইলিয়াস (আ.) বালের পুরোহিতদের মতো কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি করলেন না, কোনো নাচানাচি করলেন না, নিজের শরীরে আঘাত করলেন না। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও বিনম্রভাবে আকাশের দিকে হাত তুলে দোয়া করলেন। বাইবেলে লিপিবদ্ধ সেই ঐতিহাসিক দোয়াটি হলো:

"হে সদাপ্রভু, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ঈশ্বর! আজ তুমি প্রমাণ করো যে, তুমিই ইসরাইলের ঈশ্বর, আর আমি তোমার দাস এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কাজ করেছি। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দাও, আমাকে উত্তর দাও, যাতে এই লোকেরা জানতে পারে যে, তুমিই সদাপ্রভু ঈশ্বর এবং তুমিই তাদের হৃদয় আবার ফিরিয়ে আনছ।" (১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৭)।

এই দোয়াটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য করি:
১. **তিনি পূর্বপুরুষদের ঈশ্বরের নামে ডাকলেন:** ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আ.) এঁরা ছিলেন বনী ইসরাইলের মূল ধারার নবী। ইলিয়াস (আ.) এটা স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি কোনো নতুন ধর্ম প্রচার করছেন না; বরং তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বীনকেই ফিরিয়ে আনছেন।
২. **তিনি আল্লাহর গৌরব ও নিজের দাসত্বের কথা বললেন:** তিনি বললেন, "আমি তোমার দাস এবং তোমার আদেশেই এই কাজ করেছি।" এর অর্থ, তিনি নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করতে আসেননি; তিনি এসেছেন আল্লাহর নাম প্রতিষ্ঠা করতে।
৩. **উদ্দেশ্য স্পষ্ট করলেন:** তাঁর দোয়ার উদ্দেশ্য ছিল, যাতে লোকেরা জানতে পারে আল্লাহই একমাত্র সত্য ঈশ্বর এবং তাদের হৃদয় আবার সত্যের দিকে ফিরে আসে। এটাই ছিল তাঁর মিশনের মূল লক্ষ্য।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ:
ইসলামে আমরা বিশ্বাস করি, সকল নবীই একই তাওহীদের বাণী প্রচার করেছেন। ইলিয়াস (আ.)-এর এই দোয়াটি তাওহীদের মূল চেতনায় পরিপূর্ণ। তিনি সরাসরি আল্লাহকে সম্বোধন করেছেন, কোনো মাধ্যম ছাড়াই। তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়। এটি আমাদের শেখায়, আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় আমাদের অন্তর যেন খাঁটি হয় এবং উদ্দেশ্য যেন হয় সত্যকে সমুন্নত করা।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৮-এর শেষে):

১. আমি কি আমার জীবনে "দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা" অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছি? নাকি এখনো আল্লাহ ও দুনিয়ার মধ্যে দোলাচলে আছি?

২. ইলিয়াস (আ.) যখন বেদীতে পানি ঢাললেন, তখন তিনি আসলে আল্লাহর ওপর কতটা ভরসা রেখেছিলেন! আমি কি আমার কাজে এ ধরনের তাওয়াক্কুল দেখাই?

৩. ইলিয়াস (আ.)-এর দোয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল "লোকেরা যেন জানতে পারে।" আমার দোয়া ও আমলের উদ্দেশ্য কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সত্যের প্রচার, নাকি আত্মপ্রচার?

অধ্যায় ৯: আসমান থেকে আগুন – মুহূর্তের মধ্যে মিথ্যার দাহন

ইলিয়াস (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত, শান্ত অথচ গভীর বিশ্বাসপূর্ণ দোয়াটি শেষ হতে না হতেই ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। আসমান থেকে এক প্রচন্ড আগুনের শিখা নেমে এলো এবং চোখের পলকে বেদীর ওপরের কুরবানি, কাঠ, পাথর, মাটি সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এমনকি বেদীর চারপাশের গর্তে জমে থাকা পানিও সেই আগুনের তাপে মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। (১ রাজাবলি ১৮:৩৮)। এই অধ্যায়ে আমরা সেই আগুনের তাৎপর্য, জনতার আকীদার পরিবর্তন এবং এই বিজয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করব।

যে আগুন পাথর ও পানি সব গ্রাস করল

যে আগুন আসমান থেকে নেমে এসেছিল, তা কোনো সাধারণ আগুন ছিল না। এটি ছিল আল্লাহর কুদরতের এক বিশেষ নিদর্শন। সাধারণ আগুন কাঠ ও মাংস পোড়াতে পারে, কিন্তু পাথর ও পানি পোড়াতে পারে না। কিন্তু এই আগুন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এক অলৌকিক শিখা, যা পাথর পর্যন্ত পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিল এবং পানিকে মুহূর্তের মধ্যে বাষ্পীভূত করেছিল। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে এক দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা: "আমিই একমাত্র সত্য ইলাহ, আর ইলিয়াস আমার সত্য নবী।"

পবিত্র কোরআনে এই ঘটনার সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও, আল্লাহ তাআলা অন্যান্য নবীর মুজিজা হিসেবে আসমান থেকে আগুন বা খাবার নাজিল হওয়ার কথা বলেছেন। সূরা মায়েদায় হযরত ঈসা (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ বলেন, "যখন তুমি আমার অনুমতিক্রমে মাটি থেকে পাখির আকৃতি তৈরি করতে এবং তাতে ফুঁ দিতে, আর তা আমার অনুমতিক্রমে পাখি হয়ে যেত... এবং যখন আমি বনী ইসরাইলকে তোমার থেকে বিরত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলে..." (সূরা মায়েদা: ১১০)। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর তাফসীরে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, "ইলিয়াস (আ.) যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তখন আসমান থেকে আগুন নেমে এলো এবং কুরবানি ভস্ম করে দিল। এটা ছিল বালের পুরোহিতদের জন্য চরম অপমান এবং আল্লাহর নবীর জন্য চরম সম্মান।"

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ:

বিজ্ঞান বলে, আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদানের প্রয়োজন জ্বালানি (Fuel), তাপ (Heat) এবং অক্সিজেন (Oxygen)। ভেজা কাঠে আগুন জ্বালানো অত্যন্ত কঠিন, কারণ পানির উপস্থিতি তাপ শোষণ করে এবং জ্বালানিকে অক্সিজেন থেকে আলাদা করে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে এই নিয়ম শিথিল হয়ে যায়। যিনি আগুনের স্রষ্টা, তিনি চাইলে পানির মধ্যেও আগুন জ্বালাতে পারেন। হযরত ইব্রাহিম (আ.)-কে যখন নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছিল, তখন আল্লাহ তাআলা আগুনকে বলেছিলেন: " **يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ** " – "হে আগুন, তুমি ইব্রাহিমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।" (সূরা আম্বিয়া: ৬৯)। সুতরাং, যিনি আগুনকে ঠান্ডা করতে পারেন, তিনি চাইলে পানির ওপরেও আগুন জ্বালাতে পারেন।

জনতার আকীদার পরিবর্তন: "আল্লাহই একমাত্র সত্য"

আসমান থেকে আগুন নেমে সবকিছু ভস্ম করে দেওয়ার দৃশ্য দেখে কারমেল পর্বতের চূড়ায় জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষ থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারা সারা দিন ধরে বালের পুরোহিতদের চিৎকার-চেঁচামেচি, নাচ-গান ও রক্তপাত দেখেছে, কিন্তু কোনো ফল পায়নি। আর এখন তারা দেখল, ইলিয়াস (আ.)-এর একটি মাত্র শান্ত দোয়ায় আসমান থেকে আগুন নেমে এলো এবং সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিল। এই দৃশ্য তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় ও মহত্ত্বের অনুভূতি জাগ্রত করল।

বাইবেলের ভাষায়: **"এই দেখে সমস্ত লোকেরা উপুড় হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল, 'সদাপ্রভুই ঈশ্বর! সদাপ্রভুই ঈশ্বর!'"** (১ রাজাবলি ১৮:৩৯)। আরবিতে এর অর্থ দাঁড়ায়: **"الرب هو الله! الرب هو الله!"** (আর-রব্বু হুওয়াল্লাহ! আর-রব্বু হুওয়াল্লাহ!)।

এটি ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যে জাতি বছরের পর বছর ধরে বালকে ডাকছিল, তারা এখন একবাক্যে স্বীকার করল যে, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ। ইলিয়াস (আ.)-এর দোয়ার উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো। তিনি আল্লাহর কাছে চেয়েছিলেন, "যাতে এই লোকেরা জানতে পারে যে, তুমিই সদাপ্রভু ঈশ্বর।" আর আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন।

এই ঘটনার পর ইলিয়াস (আ.) জনতাকে নির্দেশ দিলেন, "বালের পুরোহিতদের ধরো, তাদের একজনকেও পালাতে দিও না।" তারা সকল পুরোহিতকে ধরে ফেলল। ইলিয়াস (আ.) তাদের নিয়ে গেলেন কিশোন নদীর তীরে এবং সেখানে তাদের হত্যা করা হলো। (১ রাজাবলি ১৮:৪০)। তাওরাতের বিধান অনুযায়ী, যারা মানুষকে মূর্তিপূজায় প্ররোচিত করে এবং আল্লাহর সাথে শিরক করে, তাদের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। ইলিয়াস (আ.) এই বিধান বাস্তবায়ন করলেন, যাতে মিথ্যার প্রচারকরা আর কখনো মানুষকে বিভ্রান্ত করতে না পারে।

ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় বিজয়

কারমেল পর্বতের এই ঘটনা ইতিহাসের অন্যতম নাটকীয় বিজয় হিসেবে চিহ্নিত। এটি ছিল অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর, মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের এবং শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের এক জ্বলন্ত বিজয়। এই বিজয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে:

১. এটি ছিল একক ব্যক্তির বিজয়: ইলিয়াস (আ.) একা ছিলেন। তাঁর বিপরীতে ছিল ৪৫০ জন পুরোহিত, রাজা আহাবের সমর্থন, রানি ইজেবেলের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পুরো রাষ্ট্রযন্ত্র। কিন্তু সত্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা ক্ষমতা কোনো বাধা হতে পারে না।

২. এটি ছিল চূড়ান্ত ও দ্ব্যর্থহীন বিজয়: আগুন আসা ছিল এমন একটি মুজিজা, যার কোনো বিকল্প ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বালের পুরোহিতরা যদি চিৎকার করে আগুন নামাতে পারত, তাহলে তারা বলতে পারত, এটা তাদের ক্ষমতা। কিন্তু তারা পারেনি। অন্যদিকে ইলিয়াস (আ.) যখন পানিতে ভেজা কাঠের ওপর আগুন নামালেন, তখন স্পষ্ট হয়ে গেল, এটি একমাত্র আল্লাহর কাজ।

৩. এটি ছিল জনতার হৃদয় পরিবর্তনের বিজয়: হাজার হাজার মানুষ নিজ চোখে সত্য প্রত্যক্ষ করল এবং আল্লাহর দিকে ফিরে এলো। এটি ছিল ইলিয়াস (আ.)-এর মিশনের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

ইসলামী ইতিহাসের আলোকে শিক্ষা:
ইসলামের ইতিহাসেও আমরা এমন নাটকীয় বিজয় দেখতে পাই। বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল কম, অস্ত্র ছিল অপ্রতুল, কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে তারা বিজয়ী হয়েছিলেন। কোরআনে আল্লাহ বলেন: **"وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ"** – "আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল।" (সূরা আলে ইমরান: ১২৩)। ইলিয়াস (আ.)-এর বিজয়ও ছিল তেমনি এক অসম্ভব বিজয়, যা আল্লাহর বিশেষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:
আজকের যুগে আমরা হয়তো আসমান থেকে আগুন নামার মতো মুজিজা দেখতে পাই না, কিন্তু আমরা প্রতিনিয়ত আল্লাহর নিদর্শন দেখতে পাই। একটি জাতি যখন সত্যের পথে অটল থাকে, তখন আল্লাহ তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয় দান করেন। ইতিহাস সাক্ষী, যুগে যুগে সত্যের পথিকেরা সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও বিজয়ী হয়েছে। আমাদের প্রয়োজন ইলিয়াস (আ.)-এর মতো তাওয়াক্কুল ও আত্মবিশ্বাস।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ৯-এর শেষে):
১. আমি কি আমার জীবনে কখনো সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহর বিশেষ সাহায্য প্রত্যক্ষ করেছি?
২. "الرب هو الله" (আল্লাহই প্রভু) এই ঘোষণাটি কি শুধু মুখে উচ্চারণ করি, নাকি আমার কাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটাই?
৩. মিথ্যার প্রচারকদের বিরুদ্ধে ইলিয়াস (আ.)-এর কঠোর পদক্ষেপ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? আমরা কি সমাজের অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যথাযথ অবস্থান নিই?

অধ্যায় ১০: রহমতের বৃষ্টি — খরার অবসান

কারমেল পর্বতে মিথ্যার পরাজয় ও সত্যের বিজয় সম্পন্ন হওয়ার পরও একটি বড় কাজ বাকি ছিল। সাড়ে তিন বছর ধরে আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি। জমিন ফেটে চৌচির, মানুষ ও পশুপাখি তৃষ্ণায় কাতর। ইলিয়াস (আ.) জানতেন, আল্লাহর ক্রোধের কারণ ছিল শিরক ও মূর্তিপূজা। এখন যেহেতু মানুষ তাদের ভুল স্বীকার করেছে এবং বালের পুরোহিতদের হত্যা করা হয়েছে, তাই আল্লাহর রহমতের দরজা আবার খুলে যাবে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখব কিভাবে ইলিয়াস (আ.)-এর ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা খরার অবসান ঘটিয়ে রহমতের বৃষ্টি নাজিল করেছিলেন।

সাতবার দূত পাঠানোর শিক্ষা: ধৈর্য ও দৃঢ় বিশ্বাস

বালের পুরোহিতদের হত্যার পর ইলিয়াস (আ.) রাজা আহাবকে বললেন, "তুমি ওঠো, খাওয়া-দাওয়া করো, কারণ প্রচুর বৃষ্টির শব্দ শোনা যাচ্ছে।" (১ রাজাবলি ১৮:৪১)। আহাব খেতে গেলেন, আর ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতের চূড়ায় উঠে গেলেন। তিনি মাটিতে উপুড় হয়ে তাঁর মাথা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে দিলেন এটি ছিল অত্যন্ত বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দোয়ার ভঙ্গি।

তারপর তিনি তাঁর সেবককে বললেন, "যাও, সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখো, কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা।" সেবক গিয়ে ফিরে এসে বলল, "কিছুই নেই।" ইলিয়াস (আ.) বললেন, "আবার যাও।" এভাবে তিনি সাতবার সেবককে সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাঠালেন। প্রতিবারই সেবক ফিরে এসে বলল, "কিছুই নেই।" (১ রাজাবলি ১৮:৪২-৪৩)।

এই ঘটনাটি অত্যন্ত শিক্ষণীয়। ইলিয়াস (আ.) জানতেন, আল্লাহ বৃষ্টি দেবেন এটা নিয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন না কখন দেবেন। তাই তিনি ধৈর্য ধরে আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করলেন এবং বারবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। তিনি হাল ছেড়ে দেননি, নিরাশ হননি। এটি হলো দোয়ার আদব দোয়া করার পর আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي" — "তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল করা হয়, যতক্ষণ না সে তাড়াহুড়ো করে এবং বলে, 'আমি দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া কবুল হলো না।'" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৬৩৪০)। ইলিয়াস (আ.)-এর সাতবার পাঠানোর ঘটনা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় দোয়ার পর ধৈর্য ধারণ করা এবং আল্লাহর রহমতের অপেক্ষায় থাকা।

ছোট্ট মেঘ থেকে মুষলধারে বর্ষণ: আল্লাহর রহমতের নিদর্শন

সপ্তমবার যখন সেবক ফিরে এলো, তখন তার মুখে ভিন্ন কথা। সে বলল, "দেখলাম, সমুদ্র থেকে মানুষের হাতের তালুর সমান একটি ছোট মেঘ উঠছে।" (১ রাজাবলি ১৮:৪৪)। এতটুকু শুনেই ইলিয়াস (আ.) বুঝতে পারলেন, আল্লাহর রহমত এসে গেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেবককে বললেন, "যাও, আহাবকে বলো, 'রথ প্রস্তুত করো এবং নিচে নেমে যাও, নইলে বৃষ্টি তোমাকে আটকে ফেলবে।'"

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল, প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামতে শুরু করল। (১ রাজাবলি ১৮:৪৫)। যে আকাশ সাড়ে তিন বছর ধরে খাঁ খাঁ করছিল, তা হঠাৎ করেই রহমতের ধারায় ভরে গেল। জমিন আবার সিক্ত হলো, নদী-নালা জলে ভরে গেল, ফসলের খেতে আবার প্রাণ ফিরে এলো।

এই ঘটনাটি আল্লাহর রহমতের এক অপূর্ব নিদর্শন। একটি ছোট্ট মেঘ, যা মানুষের হাতের তালুর সমান, তা থেকে শুরু করে আল্লাহ তাআলা সমগ্র আকাশ বৃষ্টিতে ভরিয়ে দিলেন। এটি প্রমাণ করে, আল্লাহর রহমত যখন আসে, তখন তা অল্প থেকে শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে ব্যাপক আকার ধারণ করে। আমাদের কর্তব্য হলো, সেই ছোট্ট নিদর্শনটুকু দেখেই আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং তাঁর রহমতের পূর্ণতা কামনা করা।

ইসলামী তাফসীরে এই ঘটনার তাৎপর্য:

ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, "ইলিয়াস (আ.)-এর এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো তাঁর নবীদের মাধ্যমে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব দান করেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, নবীগণ সত্যবাদী এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান। বৃষ্টি বন্ধ হওয়া ও আবার শুরু হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন।"

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ"** – "আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন মানুষের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর, এবং তিনি তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। আর তিনিই অভিভাবক, প্রশংসিত।" (সূরা শুরা: ২৮)। ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা এই আয়াতের এক জীবন্ত উদাহরণ। মানুষ যখন সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গিয়েছিল, তখনই আল্লাহ রহমতের বৃষ্টি নাজিল করলেন।

কারমেল থেকে শমরিয়া: ইলিয়াসের অলৌকিক দৌড়

বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর রাজা আহাব রথে চড়ে শমরিয়ার দিকে রওনা হলেন। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ইলিয়াস (আ.) আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে রাজার রথের আগে আগে দৌড়ে শমরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। (১ রাজাবলি ১৮:৪৬)। এটি ছিল ইলিয়াস (আ.)-এর আরেকটি মুজিজা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর সম্মাননার নিদর্শন। রাজার সামনে নবীকে দৌড়াতে দেখে মানুষ বুঝতে পারল, আল্লাহর নবী সত্যিই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই অংশটি নিয়ে সতর্কতা:

ইসলামী ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোতে ইলিয়াস (আ.)-এর এই দৌড়ের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়নি। তবে এটি যদি সত্য হয়, তবে তা আল্লাহর কুদরতেরই অংশ, যেভাবে সুলাইমান (আ.)-এর জন্য বাতাসকে বশীভূত করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ইসলামী বিশ্বাসমতে, নবীরা মানুষের মতোই দৈহিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকেন, যদি না আল্লাহ বিশেষ মুজিজা দান করেন।

রহমতের বৃষ্টি ও আমাদের জীবন

ইলিয়াস (আ.)-এর এই ঘটনা আমাদের রিজিক ও রহমত সম্পর্কে একটি গভীর শিক্ষা দেয়। আমরা প্রায়ই ভাবি, আমাদের চেষ্টা ও পরিকল্পনার ফলেই আমরা সফল হই। কিন্তু বাস্তবে, আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনো চেষ্টাই সফল হয় না। একটি ছোট্ট মেঘ থেকে যেমন মুষলধারে বৃষ্টি হতে পারে, তেমনি একটি ছোট্ট সুযোগ থেকেও আল্লাহ আমাদের জীবনে বিশাল রিজিকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। আমাদের কাজ হলো, ইলিয়াস (আ.)-এর মতো ধৈর্য ধরে আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করা এবং দোয়া করা।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:

আজকের দুনিয়ায় আমরা অর্থনৈতিক মন্দা, চাকরির অনিশ্চয়তা, ব্যবসায়ের ক্ষতি এসব নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। আমরা ভুলে যাই, যিনি সাড়ে তিন বছরের খরার পর এক মুহূর্তে বৃষ্টি নামাতে পারেন, তিনি আমাদের জীবনের খরাও এক মুহূর্তে দূর করতে পারেন। শর্ত হলো, আমাদের ফিরে আসতে হবে তাঁর দিকে, যেভাবে ইসরাইলিরা ইলিয়াস (আ.)-এর ডাকে ফিরে এসেছিল।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১০-এর শেষে):

১. আমি কি দোয়ার পর ধৈর্য ধরে আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করি, নাকি তাড়াহুড়ো করে হতাশ হয়ে পড়ি?
২. আমার জীবনের 'ছোট্ট মেঘ' কোনটি? অর্থাৎ, সেই ছোট্ট নিদর্শনটি কী, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে আশার আলো দেখিয়েছেন?
৩. ইলিয়াস (আ.)-এর মতো আমি কি আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি নামার আগেই তাঁর শোকর আদায় করতে পারি?

তথ্যসূত্র (তৃতীয় পর্বের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা সাফফাত (১২৩-১৩২), সূরা আনআম (৮৫), সূরা বাকারা (২৫৫), সূরা আম্বিয়া (৬৯), সূরা মায়েদা (১১০), সূরা শুরা (২৮)।
২. তাফসীর ইবনে কাসির (সূরা সাফফাত ১২৩-১৩২, সূরা আনআম ৮৫)।
৩. তাফসীরে কুরতুবি (সূরা সাফফাত)।
৪. তাফসীরে তাবারি (সূরা সাফফাত)।
৫. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ১ রাজাবলি (১৭, ১৮, ১৯ অধ্যায়)।
৬. "Stories of the Prophets" – ইবনে কাসির (ইংরেজি অনুবাদ, অধ্যায়: ইলিয়াস)।
৭. "Elijah: Prophet of Fire" – F.B. Meyer.
৮. "The Prophets of Israel" – Leon J. Wood.
৯. "Ugaritic Texts and the Bible" – Peter C. Craigie.

১০. "Manners and Customs in the Bible" – Victor H. Matthews.
১১. সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৬৩৪০)।

চতুর্থ পর্ব: ইতিহাসের গর্ভে ধ্বংস ও বিস্মৃতি

প্রত্যেক অত্যাচারী ও সত্যবিদ্বেষীর জন্যই ইতিহাসের পাতা একটি নির্দিষ্ট পরিণতি লিখে রাখে। ফেরাউনের লাশ যেমন নীল নদের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল, নমরুদের দম্ভ যেমন মশার আক্রমণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল, তেমনি ইসরাইলের সেই অহংকারী রানি ইজেবেল এবং তার স্বামী রাজা আহাবের জন্যও ইতিহাস নির্ধারণ করেছিল এক ভয়াবহ ও শিক্ষণীয় পরিণতি। অন্যদিকে, আল্লাহর প্রিয় নবী ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায়টিও রহস্য ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। কিভাবে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত নবীকে উত্তরাধিকার প্রদান করলেন এবং কিভাবে তিনি ইতিহাসের গর্ভ থেকে চিরকালের জন্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন এসবই এই পর্বের মূল আলোচ্য বিষয়। এই পর্বে আমরা প্রত্যক্ষ করব, কিভাবে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব ইতিহাসের চূড়ান্ত ফয়সালায় পৌঁছায় এবং কিভাবে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে সম্মানিত করেন এবং তার শত্রুদের ধ্বংস করেন।

অধ্যায় ১১: ইজেবেলের অভিশপ্ত পরিণতি

কারমেল পর্বতের মহাবিজয়ের পর ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য সময়টা ছিল এক অদ্ভুত মিশ্র প্রতিক্রিয়ার। একদিকে হাজার হাজার মানুষ এক আল্লাহর দিকে ফিরে এসেছিল এবং বৃষ্টি নেমে এসেছিল, যা ছিল এক অনন্য বিজয়। অন্যদিকে, এই ঘটনার সংবাদ যখন রানি ইজেবেলের কানে পৌঁছাল, তখন তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। যে নারী তার সারা জীবন বালপূজার প্রসারে উৎসর্গ করেছিলেন, যিনি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বালের শত শত পুরোহিত নিয়োগ করেছিলেন, তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না যে তার সমস্ত পরিকল্পনা এক ব্যক্তির কাছে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। ইজেবেলের এই অহংকার ও ক্রোধই তাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই অধ্যায়ে আমরা ইজেবেলের সেই ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ জানব, যা ইতিহাসে এক অমোচনীয় কলঙ্ক হিসেবে লেখা আছে এবং যা আমাদের শেখায় যে, অহংকার কখনো সত্যকে মেনে নিতে পারে না, আর যারা আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে অপমানজনক শাস্তি।

অহংকার কখনো সত্য মানে না

কারমেল পর্বতের ঘটনার পর ইলিয়াস (আ.) যে বার্তা পেলেন, তা ছিল সত্যিই হতাশাজনক। রাজা আহাব যদিও বৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে শমরিয়া ফিরে গেলেন, কিন্তু ইজেবেলের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আহাব ফিরে গিয়ে ইজেবেলকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন কিভাবে ইলিয়াস আগুন নামিয়েছিলেন, কিভাবে বালের পুরোহিতদের হত্যা করা হয়েছে। এই সংবাদ শোনার পর ইজেবেলের প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়াবহ। তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে এই মর্মে শপথ করলেন: **"তুমি যদি ইলিয়াস হও, আর আমি যদি ইজেবেল হই, তবে আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আমি তোমার প্রাণ সেই পুরোহিতদের প্রাণের মতো না করি, তবে দেবতারা আমার আরও সর্বনাশ করুন।"** (১ রাজাবলি ১৯:২)।

এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে আমরা ইজেবেলের চরিত্রের তিনটি মারাত্মক ত্রুটি দেখতে পাই। প্রথমত, তার অহংকার। তিনি নিজের ক্ষমতা ও দেবতাদের নামে শপথ করছেন, অথচ তিনি নিজের চোখেই দেখেছেন বা শুনেছেন যে তার দেবতারা আগুন পাঠাতে পারেনি। তবুও তিনি অহংকারবশত সত্যকে স্বীকার করছেন না। দ্বিতীয়ত, তার প্রতিহিংসাপরায়ণতা। তিনি ইলিয়াসকে হত্যা করার জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছেন। তৃতীয়ত, তার আত্মবিভ্রম। তিনি নিজেকে এতটাই ক্ষমতাশালী ভাবছিলেন যে, তিনি আল্লাহর নবীর জীবন নিয়ে শপথ করছেন, অথচ তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, যিনি আসমান থেকে আগুন নামাতে পারেন, তিনি তাঁর নবীকে রক্ষা করতেও সক্ষম।

ইজেবেলের এই হুমকি পাওয়ার পর ইলিয়াস (আ.)-এর মনে এক অদ্ভুত ভয় ও হতাশার সঞ্চার হলো। যে মানুষটি একা ৪৫০ জন পুরোহিতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলেন এবং আসমান থেকে আগুন নামিয়েছিলেন, তিনি এখন এক নারীর হুমকিতে ভীত হয়ে পড়লেন। বাইবেলের ভাষায়, "ইলিয়াস ভয় পেয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য দৌড়ালেন।" (১ রাজাবলি ১৯:৩)। তিনি তার সেবককে বিয়ার-শেবায় রেখে একা এক দিনের পথ মরুভূমিতে চলে গেলেন। সেখানে একটি ঝাড়ুর গাছের নিচে বসে তিনি মৃত্যু কামনা করে বললেন, **"যথেষ্ট হয়েছে, হে সদাপ্রভু, এখন আমার প্রাণ নিয়ে নাও, কারণ আমি আমার পূর্বপুরুষদের চেয়ে ভালো নই।"** (১ রাজাবলি ১৯:৪)।

ইলিয়াস (আ.)-এর এই মানসিক অবস্থা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা দেয়। নবীগণও মানুষ। তাদের মধ্যেও কখনো কখনো ক্লান্তি, ভয় ও হতাশা আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের পরিত্যাগ করেন না। ইলিয়াস (আ.) যখন হতাশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, তখন একজন ফেরেশতা এসে তাকে স্পর্শ করলেন এবং বললেন, "ওঠো, খাও।" তিনি দেখলেন, তার মাথার কাছে পোড়া রুটি ও এক কলসি পানি রাখা আছে। তিনি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ফেরেশতা দ্বিতীয়বার এসে তাকে আবার খেতে বললেন এবং বললেন, **"ওঠো, খাও, কারণ তোমাকে অনেক পথ যেতে হবে।"** তিনি সেই খাবারের শক্তিতে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত পথ চলে হোরেব পর্বতে উপস্থিত হলেন। (১ রাজাবলি ১৯:৫-৮)।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন, কিন্তু কখনো তাদের একা ছেড়ে দেন না। যখনই তাঁর বান্দা ভেঙে পড়ে, তখনই তিনি অদৃশ্য সাহায্য পাঠিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন এবং পুনরুজ্জীবিত করেন। হোরেব পর্বতে পৌঁছে ইলিয়াস (আ.) একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন। সেখানে আল্লাহ তাআলা তার সাথে কথা বললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ইলিয়াস, তুমি এখানে কী করছ?" ইলিয়াস (আ.) তাঁর মনের বেদনা ব্যক্ত করে বললেন, "আমি সদাপ্রভু সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের জন্য অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলাম, কারণ ইসরাইলীরা তোমার নিয়ম অমান্য করেছে, তোমার বেদীগুলো ভেঙে ফেলেছে এবং তোমার নবীদের তলোয়ার দিয়ে হত্যা করেছে। আমি একাই বেঁচে আছি, আর তারাও আমার প্রাণ নিতে চাইছে।" (১ রাজাবলি ১৯:১০)।

তখন আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-কে গুহার বাইরে দাঁড়াতে বললেন। প্রবল বাতাস এলো, পাথর খন্ড-বিখন্ড হলো, কিন্তু আল্লাহ সেই বাতাসে ছিলেন না। বাতাসের পর ভূমিকম্প হলো, কিন্তু আল্লাহ সেই ভূমিকম্পেও ছিলেন না। ভূমিকম্পের পর আগুন এলো, কিন্তু আল্লাহ সেই আগুনেও ছিলেন না। সবশেষে এলো এক মৃদু শব্দ। সেই মৃদু শব্দের মধ্যেই ছিল আল্লাহর উপস্থিতি। (১ রাজাবলি ১৯:১১-১২)। এই দৃশ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ ইলিয়াস (আ.)-কে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি শুধু অলৌকিকতা ও শক্তির মাধ্যমেই কাজ করেন না; বরং কখনো কখনো তিনি নীরবে, মৃদু কণ্ঠে কাজ করেন। আর ইলিয়াস (আ.)-এর দায়িত্ব হলো, আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে নিজের মিশন চালিয়ে যাওয়া, ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন না হওয়া।

এরপর আল্লাহ ইলিয়াস (আ.)-কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিলেন। প্রথমত, তিনি হাজায়েলকে আরামের (সিরিয়া) রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি যেহুকে ইসরাইলের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করবেন। তৃতীয়ত, তিনি আল-ইয়াসা (ইলিশা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নবী হিসেবে অভিষিক্ত করবেন। (১ রাজাবলি ১৯:১৫-১৬)। এই তিনজনের মাধ্যমেই ইজেবেল ও আহাবের বংশের ওপর আল্লাহর ক্রোধ নেমে আসবে। এখানে আমরা দেখতে পাই, ইলিয়াস (আ.)-এর মিশন শুধু কারমেল পর্বতেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি ছিলেন ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রধর, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসরাইলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছিলেন।

রানির মৃত্যু ও ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা (কুকুরে খাওয়ার ঘটনা)

ইলিয়াস (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। রাজা আহাবের মৃত্যু হয়েছিল এক যুদ্ধে, এবং তার রক্ত কুকুরে চেটে খেয়েছিল, যেমনটি ইলিয়াস (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (১ রাজাবলি ২১:১৯, ২২:৩৮)। কিন্তু ইজেবেলের পরিণতি ছিল আরও ভয়াবহ এবং ইতিহাসের পাতায় তা বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

ইলিয়াস (আ.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী, পরবর্তীতে যেহু (Jehu) নামক এক সেনাপতি ইসরাইলের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। যেহু ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও কঠোর ব্যক্তিত্ব। তিনি আহাবের বংশকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হন। যেহু যখন তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে শমরিয়া অভিমুখে রওনা হলেন, তখন ইজেবেল বুঝতে পারলেন যে তার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তিনি ভয় পাওয়ার বা তওবা করার পরিবর্তে অহংকার ও আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করলেন।

বাইবেলের ২ রাজাবলি ৯ অধ্যায়ে ইজেবেলের মৃত্যুর যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা সত্যিই মর্মস্পর্শী ও ভয়াবহ। যেহু যখন যিস্রিয়েল নগরীতে প্রবেশ করলেন, তখন ইজেবেল প্রাসাদের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি তার চোখে সুরমা লাগিয়েছিলেন, মাথার চুল সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন এবং জানালা দিয়ে যেহুর দিকে তাকালেন। এটা ছিল তার শেষ অহংকারের প্রকাশ। তিনি চেয়েছিলেন, মৃত্যুর আগেও নিজেকে রানি হিসেবে উপস্থাপন করতে।

যেহু যখন প্রাসাদের প্রবেশপথে পৌঁছালেন, তখন ইজেবেল তাকে উপহাস করে বললেন, "হে সিমরির হন্তা, তোমার কি কুশল?" (২ রাজাবলি ৯:৩১)। সিমরি ছিল ইসরাইলের এক পূর্ববর্তী রাজা, যে মাত্র সাত দিন রাজত্ব করেছিল এবং তারপর আত্মহত্যা করেছিল। ইজেবেল এই নামে যেহুকে সম্বোধন করে তাকে হেয় করতে চেয়েছিলেন এবং বলতে চেয়েছিলেন, "তুমিও সিমরির মতোই ক্ষণস্থায়ী হবে।"

কিন্তু যেহু তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার পক্ষে কে আছে? কে?" তখন দুই-তিনজন নপুংসক জানালা দিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। যেহু বললেন, "তাকে ফেলে দাও।" তারা ইজেবেলকে ধরে জানালা দিয়ে নিচে ফেলে দিল। ইজেবেলের রক্ত দেয়ালে ও ঘোড়ার গায়ে ছিটকে পড়ল এবং যেহুর ঘোড়ার পায়ে তিনি পিষ্ট হলেন। (২ রাজাবলি ৯:৩২-৩৩)।

এরপর যেহু প্রাসাদের ভেতরে গিয়ে ভোজন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি তার লোকদের বললেন, "যাও, সেই অভিশপ্তা নারীর কী অবস্থা দেখে এসো এবং তাকে কবর দাও, কারণ সে তো রাজকন্যা।" কিন্তু যখন তারা ইজেবেলকে কবর দিতে গেল, তখন তারা দেখল যে, ইজেবেলের মাথার খুলি, পা ও হাতের তালু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারা ফিরে এসে যেহুকে খবর দিল। তখন যেহু বললেন, **"এটা সদাপ্রভুর সেই বাণী, যা তিনি তাঁর দাস তিশবীয় ইলিয়াসের মাধ্যমে বলেছিলেন: 'যিস্রিয়েলের ভূমিতে কুকুরেরা ইজেবেলের মাংস খাবে এবং ইজেবেলের মৃতদেহ যিস্রিয়েলের জমিনে গোবরের মতো হবে, যাতে কেউ বলতে না পারে যে, এটা ইজেবেল।'"** (২ রাজাবলি ৯:৩৪-৩৭)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীটি ইলিয়াস (আ.) অনেক আগেই করেছিলেন, যখন রাজা আহাব নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র দখল করার জন্য ইজেবেলের ষড়যন্ত্রে নির্দোষ নাবোতকে হত্যা করেছিলেন। তখন ইলিয়াস (আ.) আহাবকে বলেছিলেন: "সদাপ্রভু বলছেন: 'যে স্থানে কুকুরেরা

নাবোতের রক্ত চেটেছে, সেই স্থানেই কুকুরেরা তোমারও রক্ত চাটবে।' আর ইজেবেল সম্বন্ধে সদাপ্রভু বলছেন: 'কুকুরেরা যিশ্রিয়েলের প্রাচীরের পাশে ইজেবেলকে খাবে।'" (১ রাজাবলি ২১:১৯, ২৩)। ইতিহাস সাক্ষী, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ:

পবিত্র কোরআনে ইজেবেলের নাম বা তার মৃত্যুর বিবরণ সরাসরি উল্লেখ নেই। তবে কোরআনের মূলনীতি অনুযায়ী, যারা আল্লাহর নবীদের বিরোধিতা করে এবং অত্যাচার করে, তাদের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: "**فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ**" – "সুতরাং তাদের প্রত্যেককে আমি তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলাম। তাদের কারও ওপর প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তরবর্ষণকারী ঝড়, কাউকে পাকড়াও করেছিল ভয়ঙ্কর চিৎকার, কাউকে আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করেছিলাম এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।" (সূরা আনকাবুত: ৪০)।

ইজেবেলের পরিণতি এই আয়াতের এক জীবন্ত উদাহরণ। তিনি অহংকার করেছিলেন, আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলেন এবং বালপূজা ছড়িয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তাকে অপমানজনক মৃত্যু দিয়েছেন এবং তার লাশ কুকুরে খেয়েছে যা ছিল তার অহংকারের উপযুক্ত শাস্তি।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা:

ইজেবেলের ঘটনা আজকের যুগের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজও আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতাবান ও অহংকারী ব্যক্তিরা সত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং নিজেদের অজেয় মনে করে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, যারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করে, তারা কখনো জয়ী হয় না। তাদের পতন নিশ্চিত, যদিও তা কিছুটা বিলম্বে হয়। ইজেবেলের মতো আজকের 'ইজেবেল'রাও একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আমাদের কর্তব্য হলো, ইলিয়াস (আ.)-এর মতো সত্যের ওপর অটল থাকা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১১-এর শেষে):

১. ইজেবেলের অহংকার ও তার পরিণতি থেকে আমি কী শিক্ষা নিতে পারি? আমার জীবনে কি এমন কোনো অহংকার আছে, যা আমাকে সত্য গ্রহণে বাধা দিচ্ছে?

২. আমি কি কখনো সত্যের পথে চলতে গিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছি? ইলিয়াস (আ.)-এর হতাশা ও আল্লাহর সান্ত্বনা থেকে আমি কীভাবে অনুপ্রাণিত হতে পারি?

৩. আল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়, এই বিশ্বাস কি আমার অন্তরে দৃঢ় আছে? আমি কি এই বিশ্বাস নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারি?

অধ্যায় ১২: ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায় ও হযরত আল-ইয়াসা (আ.)

ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন ছিল এক বিস্ময়কর মহাকাব্য। তিনি একাকী দাঁড়িয়েছিলেন একটি জাতির বিরুদ্ধে, আসমান থেকে আগুন নেমে এসেছিল তাঁর দোয়ায়, এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা বালপূজার মূলোৎপাটন করেছিলেন। কিন্তু প্রতিটি নবীর জীবনের মতো ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনেও এসেছিল শেষ অধ্যায়। তবে তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায়টি অন্যান্য নবীদের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন ও রহস্যময়। কিভাবে তিনি তার স্থলাভিষিক্ত নবী হযরত আল-ইয়াসা (আ.)-কে দায়িত্ব প্রদান করলেন এবং কিভাবে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তা নিয়ে ইসলামী ও বাইবেলীয় বর্ণনায় কিছু পার্থক্য রয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই রহস্যময় বিদায়ের বিবরণ জানব এবং একই সাথে হযরত আল-ইয়াসা (আ.)-এর প্রতি ইলিয়াস (আ.)-এর উত্তরাধিকার প্রদানের ঘটনা বিশ্লেষণ করব।

মরুভূমির পথে আল্লাহর সান্ত্বনা ও আল-ইয়াসা (আ.)-এর আহ্বান

ইলিয়াস (আ.) যখন হোরেব পর্বতে আল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন এবং তার মনের বেদনা ব্যক্ত করছিলেন, তখন আল্লাহ তাকে যে তিনটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল আল-ইয়াসা (ইলিশা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত নবী হিসেবে অভিষিক্ত করা। আল-ইয়াসা ছিলেন শাফাতের পুত্র এবং তিনি ছিলেন আবেল-মহোলা নামক স্থানের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন একজন কৃষক, যিনি জমি চাষ করতেন।

বাইবেলের ১ রাজাবলি ১৯ অধ্যায়ে এই মনোরম ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ইলিয়াস (আ.) হোরেব পর্বত থেকে নেমে এসে আল-ইয়াসার সন্ধানে গেলেন। তিনি তাকে ক্ষেতে দেখতে পেলেন, যেখানে তিনি বারোটি জোড়া বলদ দিয়ে জমি চাষ করছিলেন এবং নিজে দ্বাদশ জোড়ার সাথে ছিলেন। ইলিয়াস (আ.) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার গায়ের চাদরটি আল-ইয়াসার ওপর ফেলে দিলেন। (১ রাজাবলি ১৯:১৯)। এই অঙ্গভঙ্গিটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে কারও গায়ে চাদর ফেলা ছিল তাকে উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মনোনীত করার প্রতীক।

আল-ইয়াসা তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। তিনি বলদগুলো রেখে ইলিয়াস (আ.)-এর পিছু নিলেন এবং বললেন, "আমি অনুরোধ করছি, আমি যেন আগে আমার বাবা-মাকে বিদায় জানিয়ে আসতে পারি, তারপর আমি তোমার অনুসরণ করব।" ইলিয়াস (আ.) তাকে বললেন, "যাও, ফিরে যাও, কারণ আমি তোমার প্রতি কী করেছি, তা ভেবে দেখো।" (১ রাজাবলি ১৯:২০)। এই কথার অর্থ হলো, "যাও, কিন্তু মনে রেখো, আমি তোমাকে যে আহ্বান জানিয়েছি, তা কোনো সাধারণ আহ্বান নয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দায়িত্ব।"

আল-ইয়াসা ফিরে গেলেন। তিনি তার এক জোড়া বলদ জবাই করলেন এবং বলদের জোয়ালের কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে মাংস রান্না করলেন এবং লোকদের খাওয়ালেন। এরপর তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর অনুসরণ করলেন এবং তার সেবক হিসেবে কাজ করতে লাগলেন। (১ রাজাবলি ১৯:২১)। এই ঘটনাটি আল-ইয়াসার দৃঢ় সংকল্প ও ত্যাগের প্রমাণ বহন করে। তিনি তার পূর্ববর্তী জীবন ও পেশাকে পেছনে ফেলে আল্লাহর নবীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ করলেন।

এরপর থেকে আল-ইয়াসা ইলিয়াস (আ.)-এর ছায়াসঙ্গী হয়ে রইলেন। তিনি তার কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করলেন এবং ভবিষ্যতের নবুয়তের দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হলেন।

কোরআনে হযরত আল-ইয়াসা (আ.)-এর উল্লেখ:

পবিত্র কোরআনে হযরত আল-ইয়াসা (আ.)-এর নাম দুটি স্থানে উল্লিখিত হয়েছে সূরা আনআমের ৮৬ নম্বর আয়াতে এবং সূরা সাদের ৪৮ নম্বর আয়াতে। সূরা আনআমে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ"** – "আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূত এদের প্রত্যেককে আমি সমগ্র বিশ্ববাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম।" (সূরা আনআম: ৮৬)। সূরা সাদে আল্লাহ বলেন: **"وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ"** – "আর তুমি স্মরণ করো ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফলকে। তারা প্রত্যেকেই ছিলেন সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা সাদ: ৪৮)।

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, আল-ইয়াসা (আ.) ছিলেন আল্লাহর একজন সম্মানিত নবী এবং ইলিয়াস (আ.)-এর পর তিনিই বনী ইসরাইলের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাফসীরে ইবনে কাসির-এ উল্লেখ করা হয়েছে, আল-ইয়াসা ছিলেন ইলিয়াস (আ.)-এর চাচাতো ভাই বা নিকটাত্মীয় এবং তিনিই ইলিয়াস (আ.)-এর পরে নবুয়তের আসনে অধিষ্ঠিত হন।

অগ্নিরথে উর্ধ্বগমন (বাইবেলীয় ধারণা) বনাম কোরআনের উত্তরাধিকার প্রদান

ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায় নিয়ে ইসলামী ও বাইবেলীয় বর্ণনার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী, ইলিয়াস (আ.) মৃত্যুবরণ করেননি; বরং তাঁকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

২ রাজাবলি ২ অধ্যায়ে এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, ইলিয়াস (আ.) ও আল-ইয়াসা গিলগল থেকে যাত্রা করছিলেন। ইলিয়াস (আ.) আল-ইয়াসাকে বললেন, "তুমি এখানে থাকো, কারণ সদাপ্রভু আমাকে বেথেলে পাঠিয়েছেন।" কিন্তু আল-ইয়াসা বললেন, "জীবিত সদাপ্রভুর দিব্য এবং তোমার জীবিত আত্মার দিব্য, আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।" তারা বেথেলে গেলেন। সেখানকার নবীগোষ্ঠীর লোকেরা আল-ইয়াসাকে বলল, "তুমি কি জানো, আজ সদাপ্রভু তোমার প্রভুকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আমি জানি। চুপ থাকো।"

এরপর ইলিয়াস (আ.) তাকে বললেন, "তুমি এখানে থাকো, কারণ সদাপ্রভু আমাকে যিরীহোতে পাঠিয়েছেন।" কিন্তু আল-ইয়াসা আবার বললেন, "আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।" তারা যিরীহোতে গেলেন। সেখানেও একই ঘটনা ঘটল। অবশেষে তারা জর্ডান নদীর তীরে পৌঁছালেন। ইলিয়াস (আ.) তাঁর চাদরটি ভাঁজ করে জর্ডান নদীর পানিতে আঘাত করলেন এবং নদী দুই ভাগ হয়ে গেল। তারা উভয়ে শুকনো পথে পার হয়ে গেলেন। (২ রাজাবলি ২:১-৮)।

নদী পার হওয়ার পর ইলিয়াস (আ.) আল-ইয়াসাকে বললেন, "আমি তোমার কাছ থেকে নেওয়ার আগে তুমি আমার কাছে কী চাও?" আল-ইয়াসা বললেন, "আমি প্রার্থনা করি, তোমার আত্মার দ্বিগুণ অংশ যেন আমার ওপর বর্তায়।" ইলিয়াস (আ.) বললেন, "তুমি কঠিন বিষয় চেয়েছ। তবুও, যদি তুমি আমাকে নেওয়ার সময় দেখতে পাও, তাহলে তোমার জন্য তা-ই হবে; নতুবা হবে না।"

তারা কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ আগুনের একটি রথ ও আগুনের ঘোড়া এসে তাদের উভয়কে পৃথক করে দিল এবং ইলিয়াস (আ.) ঘূর্ণিবায়ুতে আসমানে উঠে গেলেন। আল-ইয়াসা তা দেখে চিৎকার করে বললেন, **"আমার পিতা! আমার পিতা! ইসরাইলের রথ ও তার অশ্বারোহী!"** আর তিনি তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তখন তিনি নিজের পোশাক ছিঁড়ে দুই টুকরো করলেন। তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর গা থেকে পড়ে যাওয়া চাদরটি তুলে নিলেন এবং ফিরে এসে জর্ডান নদীর তীরে দাঁড়ালেন। তিনি ইলিয়াসের চাদর দিয়ে পানিতে আঘাত করলেন এবং বললেন, "ইলিয়াসের ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়?" তিনি পানিতে আঘাত করামাত্রই পানি দুই ভাগ হয়ে গেল এবং আল-ইয়াসা পার হয়ে গেলেন। (২ রাজাবলি ২:৯-১৪)।

এই বর্ণনা অনুযায়ী, ইলিয়াস (আ.)-কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেননি। ইহুদি ও খ্রিস্টান ঐতিহ্যে এই বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। তারা বিশ্বাস করে, ইলিয়াস (আ.) আবার ফিরে আসবেন মসীহের আগমনবার্তা নিয়ে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ ও কোরআনের বক্তব্য:

ইসলামী বিশ্বাসমতে, ইলিয়াস (আ.)-এর অগ্নিরথে ঊর্ধ্বগমনের বিষয়টি কোরআন বা সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। পবিত্র কোরআনে ইলিয়াস (আ.)-এর প্রতি সালাম ও সুনাম রেখে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁর জীবিত থাকা বা আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার কোনো উল্লেখ নেই। বরং কোরআনের মূলনীতি অনুযায়ী, প্রত্যেক নবীই মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেন: **"إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ"** – "নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।" (সূরা যুমার: ৩০)।

তবে কিছু ইসলামী পন্ডিত মনে করেন, ইলিয়াস (আ.)-এর জীবিত থাকার বিষয়টি ইসরাইলি বর্ণনার (ইসরাইলিয়াত) অংশ, যা আমরা বিশ্বাস করি না বা প্রত্যাখ্যান করি না, কিন্তু আমাদের আকীদার ভিত্তি কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) তাঁর তাফসীরে সূরা সাফফাতের ১২৩-১৩২ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করার সময় বাইবেলের অনেক অংশ উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু অগ্নিরথে ঊর্ধ্বগমনের ঘটনাটিকে তিনি স্পষ্টভাবে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যান করেননি। তিনি কেবল ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "আল্লাহই ভালো জানেন।"

অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য ইসলামী তাফসীরকারের মতে, ইলিয়াস (আ.) স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আল-ইয়াসা (আ.)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। সূরা সাফফাতের শেষে আল্লাহ তাআলা ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য সালাম ও সুনাম রেখে দেওয়ার কথা বলেছেন, যা প্রমাণ করে তিনি তাঁর মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে ফিরে গেছেন। পবিত্র কোরআনে আরও বলা হয়েছে: **"وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ"** – "আর আমি তার জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (সুনাম) রেখে দিয়েছি। ইলিয়াসের প্রতি সালাম।" (সূরা সাফফাত: ১২৯-১৩০)। এই সালাম ও সুনাম মৃত্যুর পরবর্তী সম্মানেরই নামান্তর।

ইতিহাসবিদদের মতামত ও বিশ্লেষণ:

আধুনিক বাইবেলীয় গবেষক ও ইতিহাসবিদরা ইলিয়াস (আ.)-এর অগ্নিরথে ঊর্ধ্বগমনের ঘটনাকে একটি ধর্মতাত্ত্বিক প্রতীক হিসেবে দেখেন। তারা বলেন, এটি ছিল ইলিয়াসের অসাধারণ নবুয়তী জীবনের একটি উপযুক্ত সমাপ্তি, যা তাঁর মর্যাদা ও আল্লাহর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে নির্দেশ করে। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের সাহিত্যে নায়কোচিত মৃত্যু বা অদৃশ্য হওয়ার এমন কাহিনি প্রচলিত ছিল। তবে এক্ষেত্রে বাইবেলের বর্ণনা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামী ঐতিহাসিকগণ সাধারণত এই অংশটিকে 'ইসরাইলিয়াত' হিসেবে গণ্য করেন, যার সত্যতা সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত নই। আমাদের বিশ্বাস, প্রত্যেক নবীই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং কিয়ামতের আগে একমাত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমন ঘটবে। ইলিয়াস (আ.)-এর জীবিত থাকার ধারণাটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিশ্বাস, যা ইসলামী আকীদার অংশ নয়।

হযরত আল-ইয়াসা (আ.)-এর নবুয়ত ও কার্যক্রম:

ইলিয়াস (আ.)-এর বিদায়ের পর আল-ইয়াসা (আ.) বনী ইসরাইলের নবী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কোরআন ও হাদীসে তাঁর জীবন ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও, বাইবেলের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর রেখে যাওয়া মিশন

অব্যাহত রেখেছিলেন এবং অনেক মুজিজা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইলিয়াসের যোগ্য উত্তরসূরি, যিনি বনী ইসরাইলকে সত্যের পথে রাখার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তাফসীরে ইবনে কাসির-এ উল্লেখ করা হয়েছে, আল-ইয়াসা (আ.) ইলিয়াস (আ.)-এর পরে নবী হন এবং তিনি বনী ইসরাইলের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত অব্যাহত রাখেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং সৎকর্মশীলদের তালিকাভুক্ত করেছেন।

সমসাময়িক প্রাসঙ্গিকতা ও শিক্ষা:

ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের শেষ অধ্যায় থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিতে পারি। প্রথমত, প্রতিটি মহান মিশনের জন্য একজন যোগ্য উত্তরসূরি প্রয়োজন। ইলিয়াস (আ.) আল-ইয়াসাকে প্রস্তুত করেছিলেন, যাতে তার মিশন তার অবর্তমানেও চলতে থাকে। আমাদেরও উচিত, পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনের জ্ঞান ও আদর্শে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, ইলিয়াস (আ.)-এর বিদায়ের ঘটনা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। নবী যত বড়ই হোন না কেন, একদিন তাঁকেও দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আখেরাতের জন্য। তৃতীয়ত, বাইবেল ও কোরআনের বর্ণনার পার্থক্য আমাদের শেখায়, সত্য যাচাইয়ের জন্য আমাদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস হলো পবিত্র কোরআন ও সহীহ হাদীস। ইসরাইলি বর্ণনাগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি, কিন্তু সেগুলোকে আমাদের আকীদার ভিত্তি বানানো যাবে না।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১২-এর শেষে):

১. ইলিয়াস (আ.) আল-ইয়াসা (আ.)-কে যেভাবে প্রস্তুত করেছিলেন, আমি কি আমার পরবর্তী প্রজন্মকে দ্বীনের পথে চলার জন্য প্রস্তুত করছি?
২. ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের সমাপ্তি আমাকে দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়? আমি কি আখেরাতের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নিচ্ছি?
৩. আমি কি ধর্মীয় তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোরআন ও সহীহ হাদীসকে অগ্রাধিকার দিই? নাকি আমি যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্বাস করে ফেলি?

তথ্যসূত্র (চতুর্থ পর্বের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা আনকাবুত (৪০), সূরা যুমার (৩০), সূরা আনআম (৮৬), সূরা সাদ (৪৮), সূরা সাফফাত (১২৯-১৩০)।
২. তাফসীর ইবনে কাসির (সূরা সাফফাত, আনআম, সাদ)।
৩. তাফসীরে কুরতুবি (প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ)।
৪. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ১ রাজাবলি (১৯, ২১ অধ্যায়), ২ রাজাবলি (২, ৯ অধ্যায়)।
৫. "Stories of the Prophets" – ইবনে কাসির (ইংরেজি অনুবাদ, অধ্যায়: ইলিয়াস ও আল-ইয়াসা)।
৬. "The History of the Prophets and Kings" – তাবারি (ইংরেজি অনুবাদ)।
৭. "A History of Israel" – John Bright.
৮. "The Prophets of Israel" – Leon J. Wood.
৯. "Elijah: Prophet of Fire" – F.B. Meyer.
১০. "The Bible as History" – Werner Keller.

পঞ্চম পর্ব: সমসাময়িক বাল — আমরা কাকে সেজদা করছি?

ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে আসা ইলিয়াস (আ.) ও বালের ঘটনা কি শুধুই তিন হাজার বছর আগের কোনো পুরনো কাহিনি? নাকি এর প্রতিটি অক্ষর আজও আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? আমরা যখন এই বইয়ের প্রথম পর্বে প্রাচীন কানানের সেই কৃষকের কথা পড়েছিলাম, যে এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলে দিত, তখন হয়তো আমরা শিউরে উঠেছিলাম। আমরা ভেবেছিলাম, "কী ভয়ঙ্কর বর্বরতা! কী অন্ধকার যুগ ছিল সেটা!" কিন্তু আমরা কি কখনো থেমে ভেবে দেখেছি, আমরা যাদের এতটা সভ্য ও আধুনিক ভাবি, তারা কি আসলেই সেই কানানীয় কৃষক থেকে খুব আলাদা কিছু করছে?

পার্থক্য শুধু এটুকুই আমরা পাথরের মূর্তির সামনে সেজদা দিই না। কিন্তু আমরা কি সেই অদৃশ্য শক্তিগুলোর সামনে সেজদা দিচ্ছি না, যেগুলোকে আমরা আমাদের রিজিক, আমাদের সম্মান ও আমাদের নিরাপত্তার একমাত্র নিয়ন্ত্রক মনে করি? আমাদের সমাজে 'বাল' নামক দেবতা আজ নতুন রূপ ধারণ করেছে। তার নাম এখন 'কর্পোরেট স্ট্রাকচার', 'ব্যাংক ব্যালেন্স', 'সোশ্যাল মিডিয়া অ্যালগরিদম' কিংবা 'ডিগ্রির সার্টিফিকেট'। এই পর্বে আমরা সেই আধুনিক বালদের চিহ্নিত করব, তাদের পূজার ভয়াবহতা উপলব্ধি করব এবং সবশেষে ইলিয়াস (আ.)-এর কারমেল পর্বতের সেই পানি ঢালা তাওয়াক্কুলের পাঠ নিজেদের জীবনে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব।

অধ্যায় ১৩: রিজিকের আধুনিক মূর্তিগুলো কী কী?

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা শিরককে সবচেয়ে বড় জুলুম বলে আখ্যা দিয়েছেন। সূরা লোকমানের ১৩ নম্বর আয়াতে লুকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন: **"يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ"** – "হে আমার প্রিয় পুত্র, আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।" কিন্তু শিরক কেবল মূর্তিপূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য প্রকাশ্য শিরকের চেয়ে গোপন শিরক (শিরকে খফি) নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি বলেছেন: **"إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ"** – "নিশ্চয়ই তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের ভয় করি, তা হলো ছোট শিরক।" সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, ছোট শিরক কী?" তিনি বললেন: **"الرِّيَاءُ"** – "রিয়া (লোক দেখানো আমল)।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২৩৬৩৬)।

রিয়া হলো এমন এক মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টি বা দুনিয়ার কোনো স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। আর এই রিয়ার জন্ম হয় তখনই, যখন আমরা আমাদের রিজিক, সম্মান ও নিরাপত্তার উৎস হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে মনে করতে শুরু করি। এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক জীবনের চারটি প্রধান 'মূর্তি' বা 'বাল' নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলোর সামনে আমরা প্রতিনিয়ত সেজদা দিচ্ছি, অনেক সময় টেরও পাই না।

প্রথম মূর্তি: চাকরি ও কর্পোরেট দাসত্ব – মনিব খুশি না হলে জীবন শেষ?

প্রাচীন কানানের কৃষক যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত বৃষ্টির আশায়, তেমনি আধুনিক যুগের কর্মচারী তাকিয়ে থাকে তার মনিব বা কর্পোরেট বসের মুখের দিকে। কৃষক ভাবত, বৃষ্টি না হলে তার জীবন শেষ। কর্মচারী ভাবে, বস খুশি না হলে তার চাকরি চলে যাবে, আর চাকরি গেলে তার জীবন শেষ। এই মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্যটি অত্যন্ত গভীর ও ভয়াবহ।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন: **"وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ"** – "আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিজিক এবং যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে।" (সূরা যারিয়াত: ২২)। আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট রিজিকের উৎস আকাশে, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে। কিন্তু আমরা আমাদের চিন্তা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু বানিয়ে ফেলেছি আমাদের নিয়োগকর্তাকে। আমরা মনে করি, "আমার বসই আমার রিজিকদাতা। সে যদি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে আমি ভালো থাকব। সে যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।"

এই মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয় কর্পোরেট দাসত্বের সংস্কৃতি। একজন মুমিনের জন্য কাজ করা ইবাদত, যদি তা হালাল পন্থায় হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে হয়। কিন্তু যখন কাজের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় শুধুমাত্র বসকে খুশি করা, পদোন্নতি পাওয়া কিংবা বোনাস আদায় করা তখন সেটা এক ধরনের গোপন শিরকে পরিণত হয়। কারণ তখন আল্লাহর হুকুমের চেয়ে বসের হুকুম বড় হয়ে যায়।

একটি বাস্তব উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন, আপনার বস আপনাকে একটি কাজ করতে বললেন, যাতে সামান্য পরিমাণ মিথ্যা বলা বা ধোঁকা দেওয়ার বিষয় জড়িত। আপনি জানেন, এটা ইসলামে জায়েজ নয়। এখন আপনার সামনে দ্বন্দ্ব একদিকে আল্লাহর নির্দেশ, অন্যদিকে বসের নির্দেশ। যদি আপনি আল্লাহর নির্দেশকে উপেক্ষা করে বসের নির্দেশ পালন করেন এই ভয়ে যে, "না করলে হয়তো চাকরি চলে যাবে, সংসার চলবে না" তাহলে আপনি ঠিক সেই কাজটিই করলেন, যে কাজটি ইজেবেলের যুগের ইসরাইলিরা করত। তারা ভাবত, "বালের পূজা না করলে বৃষ্টি হবে না, ফসল হবে না।"

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস স্মরণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ"** – "সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই, যদি তা স্রষ্টার অবাধ্যতার মধ্যে পড়ে।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ১০৯৫)। এই হাদীসটি আধুনিক কর্পোরেট সংস্কৃতিতে একজন মুমিনের জন্য আলোকবর্তিকা। আপনি আপনার বসের আনুগত্য করবেন, যতক্ষণ না তা আল্লাহর আনুগত্যের পরিপন্থী হয়। আর যদি পরিপন্থী হয়, তাহলে আপনাকে বলতে হবে, "আমি আল্লাহকে ভয় করি।"

কিন্তু সমস্যা হলো, শয়তান আমাদের অন্তরে রিজিকের ভয় ঢুকিয়ে দেয়। সূরা বাকারার ২৬৮ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: **"الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا"** – "শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের।"

যখন আপনি সত্য বলার কারণে চাকরি হারানোর ভয় পান, তখন বুঝবেন শয়তান আপনাকে দারিদ্র্যের ভয় দেখাচ্ছে। আর যখন আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে সত্য বলেন, তখন আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আপনার জন্য তিনি তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ দেবেন। আর আল্লাহর অনুগ্রহ

কখনো শুধু টাকা-পয়সার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা অন্তরের প্রশান্তি, পরিবারে বরকত এবং আখেরাতের অফুরন্ত পুরস্কার হিসেবে আসে।

ইতিহাসবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতামত:

আধুনিক শিল্পবিপ্লবের পর থেকে কর্পোরেট কাঠামো মানুষের জীবনে এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে যে, মানুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও নৈতিকতা হারিয়ে ফেলছে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber) তাঁর "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" গ্রন্থে দেখিয়েছেন, কিভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে মিশে গিয়ে এক ধরনের 'কাজের নেশা' তৈরি করেছে, যেখানে কাজই হয়ে উঠেছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, চাকরি হারানোর ভয় (Job Insecurity) আধুনিক মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও পারিবারিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

ইসলাম এই সমস্যার সমাধান দিয়েছে 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর ভরসার মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا"** – "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা রাখতে, তাহলে তিনি তোমাদের পাখির মতো রিজিক দিতেন পাখি সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।" (তিরমিযী, হাদীস: ২৩৪৪)।

পাখির কোনো চাকরি নেই, কোনো বস নেই, কোনো পে-চেক নেই। কিন্তু সে আল্লাহর ওপর ভরসা করে বের হয় এবং আল্লাহ তার রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। আমরা কি পাখির চেয়েও অধম যে, আল্লাহর ওপর ভরসা করতে পারব না?

দ্বিতীয় মূর্তি: ব্যাংক ব্যালেন্স ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা

আধুনিক যুগের দ্বিতীয় বড় মূর্তিটি হলো ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জমা টাকা। আমরা প্রাচীন কানানীয়দের নিয়ে হাসাহাসি করি, যারা পাথরের মূর্তিকে বৃষ্টির দেবতা ভাবত। কিন্তু আমরা কি আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সকে আমাদের 'ত্রাণকর্তা' ভাবি না? যখন আমরা আর্থিক সংকটে পড়ি, তখন কি আমরা সবার আগে আল্লাহর কাছে হাত তুলি, নাকি সবার আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করি?

পবিত্র কোরআনে ধন-সম্পদ নিয়ে মানুষের এই মানসিকতার চমৎকার বিশ্লেষণ রয়েছে। সূরা আলাকের ৬-৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: **"كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰ"** – "কখনোই নয়, নিশ্চয়ই মানুষ সীমালঙ্ঘন করে, যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।" অর্থাৎ, যখন মানুষ মনে করে তার ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে, তখন সে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং অহংকার করে। আর যখন টাকা কমে যায়, তখন সে হতাশায় ভেঙে পড়ে। উভয় অবস্থাতেই সে আল্লাহর পরিবর্তে টাকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাআলা সূরা হাদীদের ২০ নম্বর আয়াতে দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন: **" اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ"** – "জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন তো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব-অহংকার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমরা এই প্রতিযোগিতায় এতটাই মত্ত হয়ে যাই যে, আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণই আমাদের আত্মবিশ্বাসের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়ায়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা (Financial Insecurity) এতটাই প্রবল যে, তারা বিয়ে করতে বা সন্তান নিতে ভয় পায়, কারণ তারা মনে করে, "আগে ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা জমা হোক, তারপর দেখা যাবে।" এটাও এক ধরনের শিরকী চিন্তা, কারণ আমরা ভুলে যাই যে, রিজিকদাতা আল্লাহ। সূরা হুদের ৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: **" وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا"** – "আর পৃথিবীতে কোনো বিচরণশীল প্রাণী নেই, যার রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নয়।"

ইতিহাস সাক্ষী, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার এই মূর্তি মানুষকে কত বড় পাপের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুদ, ঘুষ, জুয়া, শেয়ারবাজারে কারসাজি এসবই জন্ম নিয়েছে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নামে। মানুষ ভাবে, "সুদের টাকা ছাড়া তো ব্যবসা করা যায় না। ঘুষ না দিলে তো কাজ হয় না।" ঠিক যেভাবে কানানীয়রা ভাবত, "বাচ্চাকে আগুনে না দিলে বৃষ্টি হবে না।" উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ আল্লাহর বিকল্প কোনো ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

তৃতীয় মূর্তি: সামাজিক স্বীকৃতি ও ফলোয়ারের সংখ্যা

প্রাচীন যুগে মানুষ বালের মন্দিরে গিয়ে চিৎকার করত, নাচত, নিজেদের শরীর কাটত সবকিছুই করত দেবতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। তারা চাইত, দেবতা তাদের দেখুক, তাদের ডাকে সাড়া দিক। আধুনিক যুগে আমরা কী করছি? আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করছি, লাইক ও কমেন্টের জন্য অপেক্ষা করছি, ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য কত কিছু করছি। পার্থক্যটা কোথায়?

সামাজিক স্বীকৃতি (Social Validation) আধুনিক যুগের অন্যতম শক্তিশালী 'বাল'। মানুষ তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে অন্যের স্বীকৃতিকে দেখে। পোস্টে লাইক কম পড়লে মন খারাপ হয়, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। কেউ যদি সমালোচনা করে, তাহলে রাতের ঘুম উড়ে যায়। আমরা ভুলে যাই, আসল স্বীকৃতি কার কাছ থেকে পাওয়া উচিত।

সূরা আলে ইমরানের ১৩৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন: " **وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ**" – "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখ করো না, আর তোমরাই হবে বিজয়ী, যদি তোমরা মুমিন হও।" অর্থাৎ, একজন মুমিনের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস আসে তার ঈমান থেকে, অন্য মানুষের স্বীকৃতি থেকে নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " **مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَئُونَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ**" – "যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি খুঁজে, আল্লাহ তার জন্য মানুষের অনিষ্ট থেকে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি খুঁজে, আল্লাহ তাকে মানুষের ওপর ছেড়ে দেন।" (তিরমিযী, হাদীস: ২৪১৪)।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে এই হাদীসটি যেন আমাদের জন্য অমৃততুল্য। আমরা যদি মানুষের লাইক ও প্রশংসা পাওয়ার জন্য এমন কিছু পোস্ট করি, যা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী যেমন মিথ্যা তথ্য, অশ্লীলতা, প্রদর্শনেচ্ছা তাহলে আমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করছি। এর পরিণতি ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষের ওপর ছেড়ে দেবেন, আর মানুষ কখনো পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয় না।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিরিক্ত সময় ব্যয়কারী তরুণদের মধ্যে বিষণ্ণতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি। কারণ তারা তাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অন্যের সাথে তুলনা করে এবং নিজেকে অযোগ্য মনে করে। এটি আধুনিক বালপূজার এক মানসিক রোগ। প্রাচীন কানানীয়রা যেমন মূর্তির সামনে নিজেদের শরীর কাটত, আধুনিক মানুষ তেমনি সোশ্যাল মিডিয়ার 'অ্যালগরিদমের' কাছে নিজের আত্মসম্মান কোরবানি দিচ্ছে।

চতুর্থ মূর্তি: ডিগ্রি ও পদবির অহংকার

শিক্ষা ইসলামে ফরজ। কিন্তু শিক্ষার সার্টিফিকেট যখন অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং আল্লাহর ওপর ভরসার পরিবর্তে নিজের যোগ্যতার ওপর ভরসা তৈরি করে, তখন সেটাই 'বাল' হয়ে যায়। কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ইবলিশ আদম (আ.)-কে সেজদা করেনি তার অহংকারের কারণে। সে বলেছিল: "**أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ**" – "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।" (সূরা সাদ: ৭৬)।

আজকের সমাজে আমরা একই ভাষা শুনতে পাই: "আমি অমুক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছি, আর তুমি কোনো কলেজও পাস করতে পারোনি।" "আমার পদবী সিনিয়র ম্যানেজার, আর তুমি সাধারণ কর্মচারী।" এই অহংকারগুলো ইবলিশের অহংকারেরই প্রতিধ্বনি।

সূরা যুখরুফের ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন: "**نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا**" – "আমিই তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং তাদের একের ওপর অন্যকে মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ নিতে পারে।" অর্থাৎ, পদমর্যাদার পার্থক্য আল্লাহর নির্ধারিত একটি ব্যবস্থা, যা পারস্পরিক সহযোগিতা ও সেবার জন্য, অহংকারের জন্য নয়।

কিন্তু আমরা এই ডিগ্রি ও পদবীকে আমাদের পরিচয়ের একমাত্র উৎস বানিয়ে ফেলেছি। চাকরি হারালে আমরা শুধু আর্থিক সংকটেই পড়ি না, আমরা মানসিকভাবেও ভেঙে পড়ি, কারণ আমাদের "পরিচয়" হারিয়ে যায়। অথচ একজন মুমিনের আসল পরিচয় হলো সে আল্লাহর বান্দা। সূরা ফুরকানের ৬৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা 'ইবাদুর রহমান' বা রহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সেখানে ডিগ্রি বা পদবির কোনো উল্লেখ নেই; বরং উল্লেখ আছে নম্রতা, রাতের ইবাদত ও আল্লাহর ভয়ের কথা।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১৩-এর শেষে):

১. আমি কি আমার চাকরি বা ব্যবসাকে আল্লাহর দেওয়া রিজিকের মাধ্যম হিসেবে দেখি, নাকি রিজিকের একমাত্র উৎস হিসেবে দেখি?

২. আমি কি কখনো আল্লাহর হুকুমের চেয়ে বসের হুকুমকে প্রাধান্য দিয়েছি রিজিকের ভয়ে?

৩. আমার ব্যাংক ব্যালেন্স কি আমার আত্মবিশ্বাসের প্রধান উৎস? আমি কি টাকা জমাতে গিয়ে হালাল-হারামের তোয়াক্কা করি না?

৪. সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি কি মানুষের স্বীকৃতির জন্য এমন কিছু পোস্ট করি, যা আল্লাহ পছন্দ করেন না?

৫. আমার ডিগ্রি বা পদবী কি আমাকে অহংকারী করে তুলেছে? আমি কি নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করি?

অধ্যায় ১৪: আধুনিক শিশুবলি – আমরা কি কম জঘন্য?

প্রথম পর্বে আমরা পড়েছি কিভাবে প্রাচীন কানানীয়রা তাদের ফুটফুটে সন্তানদের বালের মূর্তির সামনে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিত। আমরা সেই বর্ণনা পড়ে শিউরে উঠেছিলাম এবং ভেবেছিলাম, "কী নিষ্ঠুর, কী বর্বর তারা ছিল!" কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, আমরা হয়তো পদ্ধতি বদলেছি, কিন্তু কাজের ফলাফল কি একই রকম ভয়াবহ নয়? আমরা হয়তো আমাদের সন্তানদের জ্বলন্ত আগুনের চুল্লিতে ফেলছি না, কিন্তু আমরা কি তাদের দুনিয়ার ক্যারিয়ারের চুল্লিতে ঠেলে দিচ্ছি না, যেখানে তাদের ঈমান, চরিত্র ও আখেরাত পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে? এই অধ্যায়ে আমরা আধুনিক 'শিশুবলি'র সেই ভয়াবহ চিত্র বিশ্লেষণ করব, যা আমরা প্রায়শই টেরও পাই না।

ক্যারিয়ারের জন্য সন্তানদের সময় ও নৈতিকতা কোরবানি দেওয়া

আজকের প্রতিযোগিতামূলক দুনিয়ায় সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা-মায়েরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তারা চায়, তাদের সন্তান "বড় কিছু" হোক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি বিশেষজ্ঞ, কর্পোরেট এক্সিকিউটিভ। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা সন্তানকে ছোটবেলা থেকেই এমন এক প্রতিযোগিতায় ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে নৈতিকতা, ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ছে।

একজন মা তার দশ বছরের ছেলেকে বলছেন, "কোরআন পড়ার সময় পরে হবে, আগে এই ম্যাথ প্র্যাকটিসটা শেষ করো। নাহলে ভালো স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না।" একজন বাবা তার মেয়েকে বলছেন, "হিজাব পরে স্কুলে গেলে তোকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবে। একটু বড় হয়ে যখন চাকরি করবি, তখন পরে নিস। এখন পড়াশোনায় মন দে।" এগুলো আমরা প্রতিদিন শুনি এবং বলি। কিন্তু আমরা কি বুঝতে পারি, এই কথাগুলোর মাধ্যমেই আমরা আমাদের সন্তানদের সামনে একটি স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছি "দুনিয়ার সাফল্যই আসল, দ্বীন পরে দেখা যাবে।"

প্রাচীন কানানীয়রা তাদের সন্তানদের বলি দিত একবার, আগুনে ফেলে। আমরা আমাদের সন্তানদের বলি দিচ্ছি প্রতিদিন, অল্প অল্প করে তাদের ঈমান, তাদের নৈতিকতা, তাদের শৈশব, তাদের পিতা-মাতার সাথে সময় কাটানোর অধিকার সবকিছু কেড়ে নিয়ে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সন্তানদের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন: "**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ**" – "হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা তাহরীম: ৬)। এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন নিজেদের ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর। কিন্তু আমরা কি করছি? আমরা তো দুনিয়ার সাফল্যের নামে তাদের জাহান্নামের আগুনের দিকেই ঠেলে দিচ্ছি!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "**كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ**" – "তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৮৯৩)। পিতা-মাতা হিসেবে আমরা আমাদের সন্তানদের দায়িত্বশীল। এই দায়িত্ব শুধু তাদের পেট ভরানো বা স্কুলে ভর্তি করানো নয়; বরং তাদের আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করাও।

কিন্তু আমরা কী করছি? আমরা সন্তানকে বলছি, "তুমি যদি ডাক্তার হতে পারো, তাহলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে।" আমরা কখনো বলি না, "তুমি যদি আল্লাহর একজন খাঁটি বান্দা হতে পারো, তাহলে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে।" আমাদের এই অগ্রাধিকারবোধই প্রমাণ করে, আমরা দুনিয়ার সাফল্যকেই আমাদের 'বাল' বানিয়ে ফেলেছি।

হারাম উপার্জনের টাকায় সন্তানের ভরণপোষণ: জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ নয় কি?

এটি আধুনিক শিশুবলির সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ। একজন পিতা হয়তো সুদের কারবার করেন, ঘুষ নেন, ব্যবসায় মিথ্যা বলেন বা ওজনে কম দেন কিন্তু তিনি মনে করেন, তিনি তো এগুলো করছেন তার সন্তানের ভালোর জন্য। তার সন্তান যেন ভালো স্কুলে পড়তে পারে, ভালো খাবার খেতে পারে, সুন্দর পোশাক পরতে পারে, এজন্য তিনি হারাম উপার্জনকে বৈধ মনে করেন। এটি হলো ইবলিশের সবচেয়ে বড় ধোঁকা।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে বলেছেন: **"وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ"** – "তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের ও তোমাদের রিজিক দিয়ে থাকি।" (সূরা আনআম: ১৫১)। আয়াতটি যদিও আরবের কন্যা শিশু হত্যার প্রথা নিয়ে নাজিল হয়েছিল, কিন্তু এর মর্মার্থ ব্যাপক। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানের ভরণপোষণের জন্য হারাম উপার্জন করাও এক ধরনের 'আধ্যাত্মিক হত্যা'। আপনি আপনার সন্তানের দেহকে বাঁচাতে গিয়ে তার আত্মাকে হত্যা করছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ"** – "নিশ্চয়ই যে গোশত হারাম উপার্জন থেকে গঠিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না; জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযুক্ত।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ১৪৪৮২)।

একবার ভাবুন তো, আপনি যে হারাম টাকায় আপনার সন্তানকে ভালো খাবার খাওয়াচ্ছেন, সেই খাবার তার দেহে গোশত হয়ে যাচ্ছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই গোশত জাহান্নামের আগুনেই নিক্ষিপ্ত হবে। তাহলে আপনি কি আপনার সন্তানকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাচ্ছেন, নাকি তার জন্যই জাহান্নামের আগুন নিশ্চিত করছেন?

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আমার পরিবারের জন্য উপার্জন করি, এতে কি কোনো পাপ হবে?" তিনি বললেন: "তুমি যদি হালাল পন্থায় উপার্জন করো এবং হালাল খাতে ব্যয় করো, তাহলে তাতে তোমার জন্য সওয়াব আছে। আর যদি হারাম পন্থায় উপার্জন করো, তাহলে তার শাস্তি ভোগ করবে তুমি এবং তোমার পরিবারও।" (সহীহ মুসলিম)।

আধুনিক অর্থনীতির জটিলতা আমাদের সামনে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে হালাল-হারামের পার্থক্য করা কঠিন মনে হয়। কিন্তু একজন মুমিনের কর্তব্য হলো, সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ"** – "হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে কিছু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকে, সে তার দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ৫২)।

আমাদের সন্তানেরা শিখছে কী? (প্রার্থনার বদলে প্রতিযোগিতা)

একটি শিশু যখন জন্ম নেয়, তখন সে ফিতরাতের (সহজাত ধর্মপ্রবণতা) ওপর জন্মায়। তার অন্তর থাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত। কিন্তু পিতা-মাতা ও সমাজ তাকে যে পরিবেশে গড়ে তোলে, তাতে সেই ফিতরাত ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ"** – "প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক বানায়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১৩৮৫)।

আজকের দুনিয়ায় আমরা আমাদের সন্তানদের কী বানাচ্ছি? আমরা কি তাদের আল্লাহর ইবাদতকারী বানাচ্ছি, নাকি প্রতিযোগিতার দাস? একটি শিশু যখন স্কুলে যায়, তখন তাকে শেখানো হয়, "তোমাকে প্রথম হতে হবে। তোমার চেয়ে ভালো কেউ হতে পারবে না।" এই শিক্ষা তাকে শেখায়, জীবন একটি যুদ্ধ, যেখানে সবাই প্রতিযোগী। অথচ ইসলামের শিক্ষা হলো, জীবন একটি পরীক্ষা, যেখানে আমরা পরস্পরের সহযোগী।

সূরা মায়েদার ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: **"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"** – "তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় পরস্পরের সহযোগিতা করো, এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।"

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ও সামাজিক পরিবেশ শিশুদের শেখায় উল্টোটা সহযোগিতা নয়, প্রতিযোগিতা। ফলাফলস্বরূপ, আমাদের সন্তানেরা বড় হয়ে এমন মানুষ হয়, যারা জানে কিভাবে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হয়, কিন্তু জানে না কিভাবে সালাতে খুশু-খুযু আনতে হয়। তারা জানে কিভাবে একটি প্রজেক্ট ডেডলাইনের মধ্যে শেষ করতে হয়, কিন্তু জানে না কিভাবে কোরআনের একটি আয়াত

নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। তারা জানে কিভাবে একটি প্রেজেন্টেশন দিয়ে বসকে ইমপ্রেস করতে হয়, কিন্তু জানে না কিভাবে তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হয়।

এটাই আধুনিক শিশুবলির সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। আমরা আমাদের সন্তানদের দুনিয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত করছি, কিন্তু আখেরাতের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত রেখেছি। প্রাচীন কানানীয়রা তাদের সন্তানদের আগুনে ফেলে দিত, যাতে তাদের কান্নার আওয়াজ বাবা-মায়ের কানে না পৌঁছায়। আমরাও আমাদের সন্তানদের দুনিয়ার প্রতিযোগিতার আগুনে ফেলে দিচ্ছি এবং তাদের আত্মার কান্না আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কারণ আমাদের কান ভরে আছে দুনিয়ার কোলাহলে।

ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ:

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধারণার জন্ম দিয়েছেন, যাকে বলে 'হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং' (Helicopter Parenting)। এরা হলেন সেই বাবা-মা, যারা তাদের সন্তানের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান, তাদের সাফল্যের জন্য অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন থাকেন এবং ছোটখাটো ব্যর্থতাও সহ্য করতে পারেন না। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ধরনের প্যারেন্টিং শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলে তারা উদ্বিগ্ন, হতাশাগ্রস্ত ও আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়ে। অথচ ইসলামী শিক্ষা হলো, সন্তানকে আল্লাহর ওপর ভরসা করতে শেখানো এবং তার জন্য দোয়া করা।

হযরত ইব্রাহিম (আ.) যখন তাঁর শিশুপুত্র ইসমাঈল (আ.) ও স্ত্রী হাজেরা (আ.)-কে মক্কার নির্জন মরুভূমিতে রেখে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি কোনো 'হেলিকপ্টার প্যারেন্ট' ছিলেন না। তিনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের রেখে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন: **"رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ"** – "হে আমাদের রব, আমি আমার বংশধরদের কিছু অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এক অনাবাদ উপত্যকায় বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব, যাতে তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা ইব্রাহিম: ৩৭)। ইব্রাহিম (আ.) চাননি তাঁর সন্তান ধনী হোক বা বিখ্যাত হোক; তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সন্তান সালাত কায়েম করুক।

আমরা কি আমাদের সন্তানদের জন্য এই দোয়াটি করি? আমরা কি বলি, "হে আল্লাহ, আমার সন্তানকে সালাত কায়েমকারী বানাও"? নাকি আমরা বলি, "হে আল্লাহ, আমার সন্তান যেন ডাক্তার হতে পারে"?

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১৪-এর শেষে):

১. আমি কি আমার সন্তানের ক্যারিয়ার গঠনের জন্য তার দ্বীনি শিক্ষা ও নৈতিকতাকে অবহেলা করছি?
২. আমি কি কখনো হারাম উপার্জনকে এই যুক্তিতে বৈধ ভেবেছি যে, "আমি তো সন্তানের জন্য করছি"?
৩. আমার সন্তানের জন্য আমার দোয়া ও পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু কী দুনিয়ার সাফল্য, নাকি আখেরাতের মুক্তি?
৪. আমি কি আমার সন্তানকে সহযোগিতা ও ভালোবাসার শিক্ষা দিচ্ছি, নাকি শুধু প্রতিযোগিতা ও আগ্রাসনের?

অধ্যায় ১৫: কারমেলের পানি ঢালা মনোভাব ফিরিয়ে আনা

আমরা এতক্ষণ আধুনিক জীবনের বিভিন্ন 'বাল' চিহ্নিত করেছি এবং দেখেছি কিভাবে আমরা অজান্তেই তাদের পূজা করছি। এবার আসা যাক সমাধানের পথে। ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন থেকে আমরা যে সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি পাই, তা হলো কারমেল পর্বতে তাঁর পানি ঢালার ঘটনা। যখন তিনি বেদীর ওপর পানি ঢালতে বলেছিলেন এবং তা তিনবার ঢালা হয়েছিল, তখন তিনি আসলে কী করেছিলেন? তিনি আল্লাহর ওপর তাঁর ভরসাকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এমন এক অবস্থা তৈরি করেছিলেন, যেখানে কোনো প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র আল্লাহর অলৌকিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আগুন আসা অসম্ভব ছিল। এই অধ্যায়ে আমরা সেই 'কারমেলের পানি ঢালা মনোভাব' বা চূড়ান্ত তাওয়াক্কুলের শিক্ষা নিজেদের জীবনে ফিরিয়ে আনার উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

তাওয়াক্কুল (ভরসা) বনাম তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা

ইসলামে তাওয়াক্কুল একটি মৌলিক ইবাদত। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ"** – "আর আল্লাহর ওপরই তোমরা ভরসা করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।" (সূরা মায়েদা: ২৩)। কিন্তু তাওয়াক্কুল বলতে আমরা কী বুঝি? অনেকে মনে করেন, তাওয়াক্কুল মানে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করা। এটি একটি ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাখির উদাহরণ দিয়েছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, পাখি "সকালে খালি

পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।" পাখি বাসায় বসে থাকেনি; সে চেষ্টা করেছে, পরিশ্রম করেছে, উড়ে বেরিয়েছে। কিন্তু তার ভরসা ছিল আল্লাহর ওপর, নিজের শক্তি বা কৌশলের ওপর নয়।

ইলিয়াস (আ.)-এর পানি ঢালার কাজটি ছিল তাওয়াক্কুলের চরম বহিঃপ্রকাশ। তিনি চেষ্টা করেছিলেন বেদী তৈরি করতে, কুরবানি প্রস্তুত করতে। কিন্তু যখন আগুন নামানোর পালা এলো, তখন তিনি এমন একটি পদক্ষেপ নিলেন, যা সব ধরনের প্রাকৃতিক সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিল। তিনি পানিতে কাঠ ভিজিয়ে দিলেন। এটা ছিল আল্লাহর ওপর তাঁর ভরসার ঘোষণা: "হে আল্লাহ, আমি আমার পক্ষ থেকে সব ধরনের চেষ্টা ও প্রস্তুতি নিয়েছি। এখন আমি এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছি, যেখানে তুমি ছাড়া আর কেউ সাহায্য করতে পারবে না। আমি শুধু তোমার দিকেই তাকিয়ে আছি।"

আমাদের জীবনে আমরা প্রায়ই বিপরীত কাজ করি। আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের ভরসা থাকে আমাদের চেষ্টা, আমাদের পরিকল্পনা, আমাদের যোগ্যতা বা আমাদের মাধ্যমগুলোর ওপর। আমরা ভুলে যাই যে, আসলে ফলাফল দেন আল্লাহ। ইলিয়াস (আ.)-এর শিক্ষা হলো, চেষ্টা করতে হবে, পরিকল্পনা করতে হবে, কিন্তু সবশেষে নিজেকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে, যেখানে আমরা বলতে পারি, "হে আল্লাহ, এবার তুমিই দেখো।"

কেন আমরা ভেজা কাঠে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছি?

আধুনিক জীবনে আমরা ঠিক এর উল্টো কাজ করছি। আমরা 'ভেজা কাঠে আগুন জ্বালানোর' চেষ্টা করছি, অথচ আমাদের ভরসা আল্লাহর ওপর নয়; বরং আমাদের নিজেদের কৌশলের ওপর। আমরা মনে করি, আমাদের চাকরিটা যদি স্থায়ী হতো, তাহলে আমরা নিরাপদ হতাম। আমাদের ব্যাংকে যদি আরও কিছু টাকা জমা থাকত, তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত হতাম। আমাদের সন্তান যদি অমুক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারত, তাহলে তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতো। এই চিন্তাগুলোই হলো 'ভেজা কাঠ' এগুলোতে আগুন জ্বালানো আল্লাহর সাহায্য ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার পরিবর্তে নিজেদের কৌশল আর পরিশ্রম দিয়ে আগুন জ্বালাতে চাই। আর ব্যর্থ হয়ে হতাশ হই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ"** – "আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা তালাক: ৩)। আমরা যদি সত্যিই বিশ্বাস করতাম যে, আল্লাহই যথেষ্ট, তাহলে আমরা আমাদের চাকরি, টাকা-পয়সা বা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হতাম না। আমরা চেষ্টা করতাম, কিন্তু ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতাম। ঠিক যেভাবে ইলিয়াস (আ.) পানি ঢেলে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখেছিলেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে তাওয়াক্কুলের একটি সুন্দর বিশ্লেষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, তাওয়াক্কুল হলো অন্তরের এমন একটি অবস্থা, যেখানে বান্দা পুরোপুরি বিশ্বাস করে যে, তার রিজিক, তার সুরক্ষা, তার সফলতা সবকিছু একমাত্র আল্লাহর হাতে। দুনিয়ার মাধ্যমগুলো কেবল উপায়, কিন্তু আসল ক্ষমতা আল্লাহর। ইলিয়াস (আ.) পানি ঢেলে মাধ্যমগুলোকে অকার্যকর করে দিয়েছিলেন, যাতে সবার কাছে স্পষ্ট হয় যে, মাধ্যম নয়, আল্লাহই আসল শক্তির উৎস।

সাড়ে তিন বছরের খরা সহ্যের শিক্ষা

ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার আরেকটি বড় শিক্ষা হলো ধৈর্য। খরার সেই সাড়ে তিন বছর শুধু ইসরাইলের সাধারণ মানুষের জন্যই কঠিন ছিল না, বরং স্বয়ং ইলিয়াস (আ.)-এর জন্যও ছিল কঠিন পরীক্ষার সময়। তাঁকে গুহায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছে, কাকের আনা খাবার খেতে হয়েছে, বিধবার ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো আল্লাহর ওপর ভরসা হারাননি, কখনো ধৈর্য হারাননি।

আমাদের জীবনেও 'খরা' আসে। অর্থনৈতিক সংকট, চাকরি হারানো, ব্যবসায় ক্ষতি, পারিবারিক অশান্তি, শারীরিক অসুস্থতা এগুলো আমাদের জীবনের খরার সময়। এই সময়ে আমাদের করণীয় কী? ইলিয়াস (আ.) আমাদের শেখান, এই সময়ে আমাদের আরও বেশি করে আল্লাহর দিকে ফিরতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে এবং আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করতে হবে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: **"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ"** – "হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা বাকারা: ১৫৩)।

ইলিয়াস (আ.) খরার সময় ধৈর্য ধরেছিলেন এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আমরা যখন বিপদে পড়ি, তখন আমরা প্রায়ই সালাতে অবহেলা করি, কোরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে দিই এবং দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকি। অথচ এটাই সেই সময়, যখন আমাদের আরও বেশি ইবাদত করা উচিত। কারণ ইবাদতের মাধ্যমেই অন্তর শান্তি পায় এবং আল্লাহর সাহায্য নেমে আসে।

তাওয়াক্কুল ও বাস্তব কর্মপন্থা: একটি ভারসাম্য

ইসলাম কখনো চরমপন্থা সমর্থন করে না। তাওয়াক্কুল মানে চেষ্টা বাদ দেওয়া নয়। ইলিয়াস (আ.) নিজেও চেষ্টা করেছিলেন তিনি কেরীৎ উপত্যকায় গিয়েছিলেন, সারিফতে গিয়েছিলেন, বেদী তৈরি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ভরসা ছিল আল্লাহর ওপর। আমাদেরও জীবনে এই ভারসাম্য আনতে হবে।

নিচে কিছু বাস্তব কর্মপন্থা দেওয়া হলো, যার মাধ্যমে আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে পারি:

১. **হালাল রিজিকের জন্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা:** চাকরি বা ব্যবসায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন না হয়ে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা যদি আল্লাহর ওপর যথাযথ ভরসা রাখতে, তাহলে তিনি তোমাদের পাখির মতো রিজিক দিতেন।" অর্থাৎ, পাখি যেমন চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে, আমাদেরও সেটাই করতে হবে।

২. **সন্দেহজনক উপার্জন থেকে দূরে থাকা:** ইলিয়াস (আ.) কাকের আনা খাবার খেয়েছেন, যা সম্পূর্ণ হালাল ছিল। বিধবার দেওয়া রুটিও হালাল ছিল। তিনি কখনো হারাম খাননি। আমাদেরও চেষ্টা করতে হবে, আমাদের উপার্জন যেন সম্পূর্ণ হালাল হয়। যদি সন্দেহ হয়, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী তা পরিত্যাগ করতে হবে।

৩. **সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া:** সন্তানের দুনিয়াবী শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষার প্রতি সমান গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের শেখাতে হবে, প্রকৃত সফলতা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সূরা আলাকের প্রথম আয়াত **"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ"** (পড়ো তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন) এই শিক্ষা সন্তানের অন্তরে গেঁথে দিতে হবে।

৪. **সালাত ও দোয়ার প্রতি যত্নবান হওয়া:** ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন সালাত ও দোয়ার গুরুত্বের এক জ্বলন্ত উদাহরণ। কারমেল পর্বতে তিনি যে দোয়া করেছিলেন, তা ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু আন্তরিক। আমাদেরও সালাতকে জীবনের কেন্দ্রে রাখতে হবে এবং সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

৫. **ধৈর্য ধারণ করা:** বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরার কোনো বিকল্প নেই। খরার সেই সাড়ে তিন বছর ইলিয়াস (আ.) ধৈর্য ধরেছিলেন। আমাদেরও জীবনের কঠিন সময়ে ধৈর্য ধরতে হবে এবং আল্লাহর রহমতের অপেক্ষা করতে হবে। সপ্তমবার দূত পাঠানোর পর যে ছোট্ট মেঘ দেখা গিয়েছিল, তা আমাদের শেখায়, আল্লাহর রহমত আসতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আসবেই।

কারমেলের আগুন আজকের জীবনে

ইলিয়াস (আ.)-এর কারমেল পর্বতের ঘটনা শুধু ইতিহাসের পাতায় সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি প্রতীকী ঘটনা, যা প্রতিটি মুমিনের জীবনে ঘটতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই 'কারমেল পর্বত' আছে সেই সব মুহূর্ত, যখন আমাদের সামনে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, যখন আমাদের ঈমান পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই 'বালের পুরোহিত' আছে সেই সব শক্তি, চিন্তা বা ব্যক্তি, যারা আমাদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে নিতে চায়। আমাদের প্রত্যেকের কাছেই 'পানি ঢালার' সুযোগ আছে যখন আমরা আমাদের সমস্ত মাধ্যম ও ভরসাকে বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে তাকাই।

আমরা যদি পারি, তাহলে আমাদের জীবনেও আসমান থেকে আগুন নেমে আসবে হয়তো প্রকৃত অর্থে নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরে ঈমানের যে আগুন জ্বলে উঠবে, তা আমাদের সকল সন্দেহ, ভয় ও হতাশাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আমাদের হৃদয় থেকে 'বাল' দূর হয়ে যাবে, এবং আমরা সমস্বরে বলতে পারব: **"الرب هو الله"** "আল্লাহই প্রভু, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ।"

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (অধ্যায় ১৫-এর শেষে):

১. আমি কি আমার জীবনে 'পানি ঢালার' মতো কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত, যেখানে আমি আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত ভরসা রাখি এবং সব মাধ্যমকে অকার্যকর বলে ঘোষণা করি?

২. আমি কি নিয়মিত আমার উপার্জনের হালাল-হারাম যাচাই করি?

৩. আমি কি বিপদের সময় ধৈর্য ধরি এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করি?

৪. আমি কি আমার সন্তানকে দুনিয়ার সাফল্যের চেয়ে দ্বীনি সাফল্যের জন্য বেশি উৎসাহিত করি?

ফিরে আসা সেই মহান রবের দিকে

প্রিয় পাঠক, আমরা ইলিয়াস (আ.)-এর সাথে দীর্ঘ এক সফর শেষ করলাম। আমরা দেখলাম, কিভাবে এক টুকরো ভূমির বৃষ্টির অনিশ্চয়তা থেকে জন্ম নিয়েছিল বাল দেবতার ধারণা। দেখলাম, কিভাবে সেই বালপূজা বনী ইসরাইলের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে গোটা জাতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। দেখলাম, কিভাবে একজন একাকী নবী আল্লাহর ওপর ভরসা করে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইতিহাসের সবচেয়ে নাটকীয় বিজয় অর্জন করেছিলেন। আর সবশেষে দেখলাম, সেই বালের ফাঁদ আজও আমাদের চারপাশে, আমাদের অন্তরে কত গভীরভাবে প্রোথিত।

এখন সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতে যে প্রশ্নটি ছুড়ে দিয়েছিলেন **"তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে?"** সেই একই প্রশ্ন আজ আমাদের সামনেও। আমরা কি এখনও দ্বিধায় ভুগব? নাকি আমরা স্পষ্ট ঘোষণা দেব: "আল্লাহই আমার রব, তিনিই আমার রিজিকদাতা, আর আমি একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব"?

যে বাল দেবতা সাড়ে তিন বছরে এক ফোঁটা পানি দিতে পারেনি, আজকের এই আধুনিক 'বাল'রাও আমাদের কিছুই দিতে পারবে না। তারা আমাদের ভয় দেখাবে, আমাদের বিভ্রান্ত করবে, কিন্তু প্রকৃত রিজিক ও নিরাপত্তা একমাত্র আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। আসুন, আমরা সবাই মিলে ইলিয়াস (আ.)-এর সেই দোয়াটি নিজেদের জন্য করি:

"হে আল্লাহ, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের রব! আজ প্রমাণ করে দিন যে, আপনিই একমাত্র সত্য ইলাহ। আমাদের অন্তরকে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনুন। আমাদের ঈমানকে কারমেল পর্বতের মতো মজবুত করে দিন। আমাদেরকে তাওয়াক্কুলের সেই পানি ঢালা মনোভাব দান করুন। আমিন।"

তথ্যসূত্র (পঞ্চম পর্বের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা লোকমান (১৩), সূরা যারিয়াত (২২), সূরা বাকারা (১৫৩, ২৬৮), সূরা আলাক (৬-৭), সূরা হাদীদ (২০), সূরা হুদ (৬), সূরা আলে ইমরান (১৩৯), সূরা সাদ (৭৬), সূরা যুখরুফ (৩২), সূরা তাহরীম (৬), সূরা আনআম (১৫১), সূরা মায়েদা (২, ২৩), সূরা ইব্রাহিম (৩৭), সূরা তালাক (৩)।
২. সহীহ বুখারী (হাদীস নং ৫২, ৮৯৩, ১৩৮৫)।
৩. সহীহ মুসলিম (হাদীস নং প্রাসঙ্গিক)।
৪. মুসনাদ আহমাদ (হাদীস নং ১০৯৫, ১৪৪৮২, ২৩৬৩৬)।
৫. তিরমিযী (হাদীস নং ২৩৪৪, ২৪১৪)।
৬. তাফসীর ইবনে কাসির (প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ)।
৭. "মাদারিজুস সালিকীন" – ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)।
৮. "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" – Max Weber.
৯. "The Paradox of Choice" – Barry Schwartz (মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ)।
১০. "Habits of the Heart" – Robert N. Bellah (আধুনিক সমাজতত্ত্ব)।
১১. "Parenting with the Brain in Mind" – Daniel J. Siegel (হেলিকপ্টার প্যারেন্টিং প্রসঙ্গে)।

উপসংহার: আমি কি প্রস্তুত?

দীর্ঘ সফর শেষে আমরা আবার প্রারম্ভিক বিন্দুতে ফিরে এসেছি শুধু ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক অর্থে নয়, বরং আত্মিক অর্থে। আমরা ইতিহাসের পাতায় বিচরণ করেছি, প্রাচীন কানানের ধুলোমাখা পথ থেকে কারমেল পর্বতের অগ্নিস্নাত চূড়া পর্যন্ত হেঁটেছি। আমরা প্রত্যক্ষ করেছি এক ভয়ঙ্কর দেবতার উত্থান, এক পথভ্রষ্ট রাজা ও রানির পতন, এবং এক মহান নবীর অতুলনীয় সাহস ও আল্লাহর প্রতি তাঁর অগাধ তাওয়াক্কুল। কিন্তু এই পুরো সফরের আসল উদ্দেশ্য ইতিহাসের তথ্য জানা ছিল না; বরং উদ্দেশ্য ছিল একটি জ্বলন্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজা **আমি কি প্রস্তুত?**

আমি কি আমার জীবনের 'কারমেল পর্বতে' দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত? আমি কি আমার সমাজে প্রচলিত 'বালদের' চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রস্তুত? আমি কি আমার অন্তরের গহীনে লুকিয়ে থাকা 'ইজেবেল' ও 'বালের পুরোহিতদের' মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত? এই উপসংহার অধ্যায়ে আমরা সেই প্রস্তুতিরই একটি রূপরেখা তৈরি করব। আমরা জানব, কিভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, কিভাবে নিজের ভেতরের শত্রুকে চিহ্নিত করে হত্যা করা যায় এবং সবশেষে কিভাবে ইলিয়াস (আ.)-এর মতো করে আল্লাহর দরবারে চূড়ান্ত প্রার্থনা জানানো যায়।

দুই নৌকায় পা রাখার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি

ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্নটি ছিল: **"তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে?"** (১ রাজাবলি ১৮:২১)। এই প্রশ্নটি শুধু তখনকার ইসরাইলিদের জন্য ছিল না; এটি কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি মানুষের জন্য এক চিরন্তন প্রশ্ন। কারণ 'দুই নৌকায় পা রাখা' বা দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা মানব প্রকৃতির একটি মৌলিক দুর্বলতা। আমরা একই সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে চাই, আবার দুনিয়ার মূর্তিগুলোর কাছেও সন্তুষ্টি কামনা করি। আমরা একই সাথে হালাল উপার্জন করতে চাই, আবার হারাম পথের লোভও সংবরণ করতে পারি না। আমরা একই সাথে সন্তানকে দ্বীনদার বানাতে চাই, আবার দুনিয়ার সাফল্যের প্রতিযোগিতায়ও ঠেলে দিই। এই দ্বৈত অবস্থানই হলো আধুনিক মুসলিমের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক সংকট।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই দ্বিধাগ্রস্ত মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। সূরা নিসার ১৪৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন: **"مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ"** – "তারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে না এদের দিকে, না ওদের দিকে।" আয়াতটি মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাজিল হলেও, এর শিক্ষা ব্যাপক। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও দুনিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান থাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কারোরই হয় না। সে আল্লাহর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে না, আবার দুনিয়াতেও প্রকৃত শান্তি পায় না। তার জীবন কাটে এক অস্থির দোলাচলে, যেখানে প্রতিটি সিদ্ধান্তই হয়ে ওঠে যন্ত্রণাদায়ক।

এই দোদুল্যমানতার মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, এর মূল কারণ দুটি। প্রথমত, **আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসের অভাব**। মানুষ যখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে না যে, আল্লাহই তার রিজিক, সম্মান ও নিরাপত্তার একমাত্র উৎস, তখন সে দুনিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমের কাছে সন্তুষ্টি কামনা করতে থাকে। দ্বিতীয়ত, **ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ**। মানুষ ভাবে, "আমি যদি আল্লাহর পথে চলি, তাহলে আমার ভবিষ্যৎ কী হবে? আমার সংসার কীভাবে চলবে?" এই ভয়ই তাকে হারাম ও হালালের মধ্যে দোলাচলে ফেলে দেয়।

ইলিয়াস (আ.)-এর শিক্ষা হলো, এই দোলাচল থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো **সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ**। তিনি ইসরাইলিদের বলেছিলেন: "যদি সদাপ্রভুই ঈশ্বর হন, তবে তাঁর অনুসরণ করো; আর যদি বাল হয়, তবে তার অনুসরণ করো।" অর্থাৎ, একটি পক্ষ বেছে নাও। দ্বিধায় ভুগে লাভ নেই। কারণ দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় থাকলে তুমি সত্যের পূর্ণ শক্তিও পাবে না, আবার মিথ্যার স্বল্পস্থায়ী সুখও পুরোপুরি ভোগ করতে পারবে না। বরং তুমি চিরস্থায়ী অশান্তির মধ্যে ডুবে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর উম্মতকে দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: **" دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ"** – "যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা ছেড়ে দাও এবং যা সন্দেহমুক্ত, তা গ্রহণ করো। কারণ সত্য প্রশান্তি আনে, আর মিথ্যা সন্দেহ ও অস্থিরতা আনে।" (তিরমিযী, হাদীস: ২৫১৮)।

আজকের যুগে আমরা কত সিদ্ধান্ত নিই, যেখানে আমরা সন্দেহের মধ্যে থাকি? ব্যবসায় একটু মিথ্যা বললে হয়তো লাভ বেশি হবে, কিন্তু মনে শান্তি থাকবে না। অফিসে বসকে খুশি করতে একটু তোষামোদ করলে হয়তো প্রমোশন হবে, কিন্তু আত্মসম্মান হারাবে। এই সব সন্দেহজনক কাজ আমাদের মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয় এবং আমাদের আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'আল-ফাওয়ায়েদ' গ্রন্থে বলেন, "দ্বিধাগ্রস্ত হৃদয় হলো শয়তানের খেলাঘর। শয়তান সেখানে সহজেই প্রবেশ করতে পারে এবং নানা রকম কুমন্ত্রণা দিতে পারে। কিন্তু যে হৃদয় একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে ধাবিত, সেখানে শয়তানের কোনো স্থান নেই।"

দোলাচল থেকে মুক্তির বাস্তব উপায়:

১. **আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর জ্ঞান অর্জন:** যখন একজন বান্দা গভীরভাবে জানতে পারে যে, আল্লাহই আর-রাজ্জাক (রিজিকদাতা), আল-হাফীজ (রক্ষাকর্তা), আল-ওয়ালী (অভিভাবক), তখন তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মাধ্যমগুলোর ভয় দূর হয়ে যায়। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে আল্লাহর যে গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা নিয়মিত তিলাওয়াত ও অর্থ অনুধাবন করলে অন্তরে তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পায়।

২. **ছোট ছোট সিদ্ধান্তে আল্লাহকে প্রাধান্য দেওয়ার অভ্যাস:** আমরা প্রায়ই ভাবি, বড় বড় পরীক্ষায় পাস করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে, ছোট ছোট সিদ্ধান্তগুলোই আমাদের চরিত্র গঠন করে। আজ যদি আপনি একটি ছোট মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকেন আল্লাহর ভয়ে, তাহলে আগামীকাল বড় মিথ্যা বলার সাহস পাবেন না। আজ যদি আপনি লোভনীয় একটি হারাম উপার্জন থেকে হাত গুটিয়ে নেন, তাহলে আগামীকাল আরও বড় লোভের মুখে আপনি টিকে থাকতে পারবেন।

৩. **নিয়মিত আত্মসমালোচনা (মুহাসাবা):** প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে নিজের কাছে প্রশ্ন করুন: "আজ আমি কি এমন কোনো কাজ করেছি, যেখানে আমি আল্লাহর চেয়ে অন্য কাউকে খুশি করার চিন্তা করেছি? আজ আমি কি কোনো দ্বিধাগ্রস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি?" হযরত উমর (রা.) বলতেন: **"حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا"** – "তোমরা নিজেদের হিসাব নাও, তার আগেই যেদিন তোমাদের হিসাব নেওয়া হবে।"

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন:

- আমার জীবনের কোন ক্ষেত্রে আমি এখনও 'দুই নৌকায় পা রেখে' চলছি?
- কোন সিদ্ধান্তটি নিতে আমি সবচেয়ে বেশি দ্বিধাবোধ করছি? আমি কি আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেই দ্বিধা কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুত?
- আজকের দিনে আমি কি অন্তত একটি কাজ করেছি, যেখানে আমি দুনিয়ার কোনো স্বার্থের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়েছি?

নিজের ভেতরের "ইজেবেল" ও "বালের পুরোহিতদের" হত্যা করা

ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতে বালের ৪৫০ জন পুরোহিতকে হত্যা করেছিলেন। পরবর্তীতে যেহু ইজেবেলকে হত্যা করেছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডগুলো ইতিহাসের নৃশংস অধ্যায় নয়; বরং এগুলো হলো প্রতীকী শিক্ষা। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই একজন 'ইজেবেল' বাস করে সেই অহংকারী সত্তা, যে সত্যকে মানতে চায় না, যে নিজের ক্ষমতা ও মতের ওপর অন্ধ বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহর নবীর বাণীকে উপহাস করে। আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই 'বালের পুরোহিতরা' বাস করে সেই সব কুপ্রবৃত্তি, কুসংস্কার ও মূর্তিপ্রেম, যা আমাদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। এই অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব, কিভাবে এই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের চিহ্নিত করে হত্যা করা যায়।

অভ্যন্তরীণ 'ইজেবেল'-কে চেনা ও হত্যা করা

ইজেবেলের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। প্রথমত, **অহংকার**। সে নিজেকে কখনো ভুল স্বীকার করত না। দ্বিতীয়ত, **সত্যের প্রতি বিদ্বেষ**। সত্য তার সামনে স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে তা মানতে চাইত না। তৃতীয়ত, **ক্ষমতার অপব্যবহার**। সে তার রাজকীয় ক্ষমতা ব্যবহার করে আল্লাহর নবীদের হত্যা করত এবং নির্দোষ নাবোতের রক্ত ঝরাত।

আমাদের ভেতরের 'ইজেবেল' কীভাবে প্রকাশ পায়? যখন আমরা কোনো আলেম বা দ্বীনি ভাইয়ের কাছ থেকে সঠিক পরামর্শ পাই, কিন্তু আমাদের অহংকার আমাদের তা মানতে বাধা দেয় তখনই আমাদের ভেতরের ইজেবেল জেগে ওঠে। যখন আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পারি, কিন্তু লোকলজ্জা বা পদমর্যাদার ভয়ে তা স্বীকার করি না তখনই ইজেবেল আমাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। যখন আমরা আমাদের ক্ষমতা বা প্রভাব ব্যবহার করে দুর্বলদের ওপর জুলুম করি তখনই আমরা ইজেবেলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা অহংকারীদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন: " **سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ**" – "আমি আমার নিদর্শন থেকে তাদের ফিরিয়ে দেব, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে।" (সূরা আরাফ: ১৪৬)। অর্থাৎ, অহংকারী ব্যক্তি সত্য দেখার ও বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "**لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ**" – "যার অন্তরে এক অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৯১)। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেউ যদি সুন্দর পোশাক ও জুতা পরতে পছন্দ করে, তাহলে কি তা অহংকার হবে?" তিনি বললেন: " **إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ**" – "নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান করা।"

আমাদের ভেতরের ইজেবেলকে হত্যা করতে হলে প্রথমেই আমাদের অহংকারকে চূর্ণ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন **তাওবা ও ইস্তিগফার**। নিয়মিত আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং নিজের ভুল স্বীকার করতে হবে। হযরত আদম (আ.) যখন ভুল করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "**رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ**" – "হে আমাদের রব, আমরা নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো, তাহলে আমরা নিশ্চিতভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।" (সূরা আরাফ: ২৩)। পক্ষান্তরে ইবলিশ অহংকার করে বলেছিল, "আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" ইবলিশের পথ ইজেবেলের পথ, আর আদম (আ.)-এর পথ হলো মুমিনের পথ।

অভ্যন্তরীণ 'বালের পুরোহিতদের' চেনা ও হত্যা করা

বালের পুরোহিতরা ছিল সেই সব ব্যক্তি, যারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে এনে মূর্তিপূজায় প্ররোচিত করত। তারা ছিল মিথ্যার প্রচারক, কুসংস্কারের ধারক-বাহক এবং সমাজে শিরকের বীজ বপনকারী। আমাদের ভেতরেও এমন কিছু কুপ্রবৃত্তি ও চিন্তাধারা আছে, যা 'বালের পুরোহিতের' ভূমিকা পালন করে। এগুলো আমাদের আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং দুনিয়ার মোহে আটকে রাখে।

এই অভ্যন্তরীণ পুরোহিতদের মধ্যে অন্যতম হলো **রিজিকের ভয়, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা, মানুষের ভয়, দুনিয়ার লোভ, এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারা**। যখনই আমরা কোনো সৎকাজ করতে চাই, তখনই এই পুরোহিতরা আমাদের মনে ফিসফিস করে বলে: "লোকেরা কী বলবে? তোমার সংসার কীভাবে চলবে? এত কষ্ট করে লাভ কী? একটু আপস করলে ক্ষতি কী?" এই ফিসফিসানিগুলোই হলো আধুনিক বালের পুরোহিতদের দাওয়াত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "**الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ**" – "প্রকৃত মুজাহিদ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যের পথে নিজের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" (মুসনাদ আহমাদ, হাদীস: ২৩৯৫৮)।

এই জিহাদ বা অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের জন্য কিছু বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে:

১. **কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন ভয়কে জ্ঞান দিয়ে প্রতিহত করা:** আমাদের অনেক ভয়ই ভিত্তিহীন। আমরা মনে করি, সত্য বললে চাকরি চলে যাবে। অথচ বাস্তবে দেখা যায়, সত্যবাদী ব্যক্তি দীর্ঘমেয়াদে বেশি সম্মানিত ও বিশ্বস্ত হয়। তাই আমাদের উচিত, কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে এই ভিত্তিহীন ভয়গুলোকে চিহ্নিত করা এবং যুক্তি দিয়ে প্রতিহত করা।

২. **ভালো সঙ্গ নির্বাচন:** বালের পুরোহিতরা একা কাজ করে না। তারা দলবদ্ধভাবে কাজ করে। আমাদের ভেতরের কুপ্রবৃত্তিগুলোও তখনই বেশি সক্রিয় হয়, যখন আমরা অসৎ সঙ্গের সংস্পর্শে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: " **الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ**" – "মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী হয়। সুতরাং তোমরা সতর্ক থাকো, কার সাথে বন্ধুত্ব করছো।" (আবু দাউদ, হাদীস: ৪৮৩৩)।

৩. **আল্লাহর যিকির ও ইবাদতের মাধ্যমে অন্তরকে শক্তিশালী করা:** একটি শক্তিশালী অন্তরে বালের পুরোহিতরা প্রবেশ করতে পারে না। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, কোরআন তিলাওয়াত, সকাল-সন্ধ্যার যিকির এগুলো অন্তরকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন: **"الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ"** – "যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা রাদ: ২৮)।

৪. **ছোট ছোট পাপ থেকে বেঁচে থাকা:** বড় পাপের শুরু হয় ছোট পাপ থেকে। বালের পুরোহিতরা প্রথমে ছোট ছোট আপস করায়, তারপর ধীরে ধীরে বড় পাপের দিকে ঠেলে দেয়। তাই ছোট পাপকেও গুরুত্ব সহকারে পরিহার করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: **"إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ"** – "তোমরা ছোট ছোট পাপকে তুচ্ছ মনে করা থেকে সাবধান থেকো।" (মুসনাদ আহমাদ)।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন:

- আমার ভেতরের 'ইজেবেল' কখন জেগে ওঠে? আমি কি আমার অহংকারকে চিহ্নিত করতে পারি?
- আমি কি নিয়মিত তাওবা ও ইস্তিগফার করি? নাকি আমার ভুল স্বীকার করতে আমার অহংকার বাধা দেয়?
- আমার ভেতরের কোন 'বালের পুরোহিত' আমাকে সবচেয়ে বেশি কুমন্ত্রণা দেয় রিজিকের ভয়, মানুষের ভয়, নাকি দুনিয়ার লোভ?
- আমি কি এই অভ্যন্তরীণ শত্রুদের বিরুদ্ধে নিয়মিত জিহাদ করছি?

চূড়ান্ত প্রার্থনা: হে আল্লাহ, আমাদের অন্তর ফিরিয়ে দাও

কারমেল পর্বতের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে ইলিয়াস (আ.) একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর দোয়া করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "হে সদাপ্রভু, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ঈশ্বর! আজ তুমি প্রমাণ করো যে, তুমিই ইসরাইলের ঈশ্বর, আর আমি তোমার দাস এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কাজ করেছি। হে সদাপ্রভু, আমাকে উত্তর দাও, আমাকে উত্তর দাও, যাতে এই লোকেরা জানতে পারে যে, তুমিই সদাপ্রভু ঈশ্বর এবং তুমিই তাদের হৃদয় আবার ফিরিয়ে আনছ।" (১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৭)।

এই দোয়ার শেষ অংশটি আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ: **"তুমিই তাদের হৃদয় আবার ফিরিয়ে আনছ।"** ইলিয়াস (আ.) জানতেন, বাহ্যিক বিজয়ই যথেষ্ট নয়। আসল বিজয় হলো অন্তরের বিজয়। আগুন নেমে এলো, বৃষ্টি নামলো, বালের পুরোহিতরা নিহত হলো কিন্তু যদি মানুষের অন্তর আল্লাহর দিকে না ফেরে, তাহলে এই সবকিছুই অর্থহীন। তাই তিনি দোয়া করেছিলেন, যেন আল্লাহ তাআলা মানুষের হৃদয়কে সত্যের দিকে ফিরিয়ে আনেন।

আজ আমাদেরও সেই একই দোয়ার প্রয়োজন, বরং আরও বেশি প্রয়োজন। আমাদের চারপাশে কত নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, কত ওয়াজ-নসীহত শুনি, কত বই পড়ি কিন্তু আমাদের অন্তর কি ফিরছে? আমরা কি প্রকৃত অর্থে তাওবা করছি? আমরা কি আমাদের জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করছি?

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা আমাদের একটি অত্যন্ত সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন: **" رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ"** – "হে আমাদের রব, তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করো না, আমাদের হেদায়েত দেওয়ার পর। আর আমাদের তোমার পক্ষ থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয়ই তুমি মহাদাতা।" (সূরা আলে ইমরান: ৮)।

এই দোয়াটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই করতেন। উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বেশি পঠিত দোয়াগুলোর মধ্যে একটি ছিল: **"يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ"** – "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অবিচল রাখো।" (তিরমিযী, হাদীস: ২১৪০)।

আমাদের এই দোয়াগুলো শুধু মুখে উচ্চারণ করলেই হবে না; বরং এর সাথে থাকতে হবে আন্তরিক প্রচেষ্টা। ইলিয়াস (আ.) যেমন পানি ঢেলে দিয়ে আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত ভরসা রেখেছিলেন, তেমনি আমাদেরও আল্লাহর কাছে চূড়ান্ত প্রার্থনা জানাতে হবে এবং নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে একটি চূড়ান্ত প্রার্থনা করি। এটি কোনো নির্দিষ্ট দোয়ার আরবি পাঠ নয়; বরং ইলিয়াস (আ.)-এর দোয়ার অনুকরণে আমাদের নিজেদের ভাষায় আল্লাহর দরবারে একটি আবেদন:

হে আমাদের রব, ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের রব, ইলিয়াসের রব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রব!

তুমি সাক্ষী থাকো, আমরা দুর্বল। আমাদের অন্তরে দুনিয়ার মোহ, রিজিকের ভয়, মানুষের ভয় এসবের 'বাল' আমরা স্থাপন করে ফেলেছি। আমরা আমাদের অহংকারের 'ইজেবেল'কে লালন-পালন করেছি। আমরা আমাদের সন্তানদের দুনিয়ার আগুনে ঠেলে দিয়েছি। আমরা দুই নৌকায় পা রেখে চলেছি এবং দ্বিধায় ভুগছি।

হে আমাদের রব! আজ আমরা তাওবা করছি। আজ আমরা আমাদের ভেতরের সমস্ত 'বালের মূর্তি' ভেঙে ফেলতে চাই। আজ আমরা আমাদের ভেতরের 'ইজেবেল' ও 'বালের পুরোহিতদের' হত্যা করতে চাই। কিন্তু হে আল্লাহ, তুমি তো জানো, আমরা নিজেরা অক্ষম। তুমি যদি আমাদের সাহায্য না করো, তাহলে আমরা কখনোই এই কাজ করতে পারব না।

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দাও তোমার দিকে, তোমার রাসূলের সুন্নাতের দিকে, তোমার কিতাবের আলোর দিকে। আমাদের অন্তর থেকে দুনিয়ার ভয় দূর করে দাও এবং সেখানে তোমার ভরসার বীজ রোপণ করে দাও।

হে আর-রাজ্জাক! আমাদের রিজিকের ভয় দূর করে দাও। আমরা বিশ্বাস করি, তুমিই একমাত্র রিজিকদাতা। আমাদের চাকরি, আমাদের ব্যবসা, আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স এসব শুধু মাধ্যম। আসল রিজিক তোমার কাছ থেকেই আসে। তুমি আমাদের হালাল রিজিক দান করো এবং হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখো।

হে আমাদের রব! আমাদের সন্তানদের তুমি দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। তাদের অন্তরে তুমি ঈমানের আলো জ্বালিয়ে দাও। তাদের দুনিয়ার সাফল্যের চেয়ে আখেরাতের সাফল্যের ফিকির দান করো। তাদেরকে তুমি সালাত কায়েমকারী বানাও।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কারমেল পর্বতে দাঁড়ানোর তাওফিক দাও। তুমি আমাদের সেই সাহস দাও, যে সাহস তুমি ইলিয়াস (আ.)-কে দিয়েছিলে। আমরা যেন একাকী হলেও সত্যের পক্ষে দাঁড়াতে পারি। আমরা যেন পানি ঢেলে দিয়ে বলতে পারি, "হে আল্লাহ, এবার তুমিই দেখো।"

হে আমাদের রব! আমাদের দোয়া কবুল করো। আমাদের ওপর তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো, যেমন বর্ষণ করেছিলে সাড়ে তিন বছরের খরার পর। আমাদের অন্তরের জমিন শুকিয়ে গেছে তুমি তা আবার সিক্ত করো তোমার রহমতের পানি দিয়ে।

আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

আত্মজিজ্ঞাসা ও ব্যক্তিগত অনুশীলন (উপসংহারের শেষে):

- আমি কি আজ থেকেই 'দুই নৌকায় পা রাখা' অবস্থা পরিত্যাগ করার জন্য একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত?
- আমি কি আমার ভেতরের 'ইজেবেল' ও 'বালের পুরোহিতদের' বিরুদ্ধে নিয়মিত জিহাদ করার সংকল্প করছি?
- আমি কি ইলিয়াস (আ.)-এর দোয়ার অনুকরণে আল্লাহর কাছে নিয়মিত প্রার্থনা করব, যেন তিনি আমার অন্তরকে সত্যের ওপর অবিচল রাখেন?

শেষ কথা: ইতিহাসের আয়না থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে

প্রিয় পাঠক, আমরা আমাদের এই দীর্ঘ সফরের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। আমরা ইতিহাসের আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখেছি। আমরা দেখেছি, প্রাচীন কানানের সেই কৃষক, যে এক ফোঁটা বৃষ্টির আশায় নিজের সন্তানকে আগুনে ফেলে দিত সে আর আমি আসলে খুব আলাদা নই। আমরা দেখেছি, ইজেবেলের অহংকার, আহাবের দুর্বলতা, বালের পুরোহিতদের ধোঁকাবাজি এসবই আমাদের সমাজে, আমাদের পরিবারে, এমনকি আমাদের নিজেদের ভেতরেও বিদ্যমান।

কিন্তু আমরা শুধু হতাশার জন্য এই ইতিহাস পড়িনি। আমরা পড়েছি আশার জন্য। কারণ ইতিহাসের এই অন্ধকার অধ্যায়ের মাঝখানেই আমরা দেখেছি এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে ইলিয়াস (আ.)-কে। তিনি একা ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর সাথে থাকায় তিনি ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তিনি দুর্বল ছিলেন, কিন্তু আল্লাহর শক্তিতে তিনি ছিলেন অপ্রতিরোধ্য। তিনি ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহর সান্ত্বনায় তিনি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমরাও পারি। আমরাও আমাদের জীবনের 'কারমেল পর্বতে' দাঁড়াতে পারি। আমরাও পানি ঢেলে দিয়ে বলতে পারি, "হে আল্লাহ, এবার তুমিই দেখো।" আর আল্লাহ তাআলা কখনো তাঁর বান্দাদের নিরাশ করেন না। তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর জন্য যেমন আসমান থেকে আগুন নাজিল করেছিলেন, আমাদের জন্যও তিনি তাঁর রহমতের দরজা খুলে দেবেন। শর্ত একটাই আমাদের ফিরতে হবে তাঁর দিকে। আমাদের ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত 'বালের' পূজা। আমাদের বেছে নিতে হবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের পথ।

ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা শেষ হয়নি। বাইবেলের বর্ণনায় তিনি অগ্নিরথে চড়ে আসমানে উঠে গেছেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে, তিনি আবার ফিরে আসবেন। ইসলামে আমরা বিশ্বাস করি, তিনি তাঁর মিশন সফলভাবে সম্পন্ন করে আল্লাহর কাছে ফিরে গেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুমিনের জন্য তাঁর সুনাম ও সালাম রেখে গেছেন।

কিন্তু ইলিয়াস (আ.)-এর মিশনের একটি দিক এখনো অসমাপ্ত তা হলো আমাদের জীবনে তাঁর শিক্ষার বাস্তবায়ন। তিনি চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া প্রশ্নটি এখনো বাতাসে ভাসছে: **"তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে?"**

এখন সময় এসেছে উত্তর দেওয়ার। এখন সময় এসেছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার। এখন সময় এসেছে প্রস্তুত হওয়ার।

আমি কি প্রস্তুত?

এই প্রশ্নটি আমি নিজেকে করছি, এবং আপনাকেও করতে অনুরোধ করছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে সমস্বরে বলি:

"الرب هو الله" "আল্লাহই প্রভু, আল্লাহই একমাত্র সত্য ইলাহ।"

আর এই ঘোষণার সাথেই আমরা আমাদের জীবনের সমস্ত 'বাল' থেকে মুক্তি ঘোষণা করি এবং একমাত্র আল্লাহর দিকে ফিরে যাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে এই মহান সত্যের ওপর অবিচল রাখুন এবং ইলিয়াস (আ.)-এর অনুসারী হিসেবে কবুল করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র (উপসংহারের জন্য):

১. পবিত্র কোরআন: সূরা নিসা (১৪৩), সূরা আরাফ (২৩, ১৪৬), সূরা রাদ (২৮), সূরা আলে ইমরান (৮)।
২. বাইবেল (পুরাতন নিয়ম): ১ রাজাবলি (১৮:২১, ১৮:৩৬-৩৭)।
৩. সহীহ মুসলিম (হাদীস নং ৯১)।
৪. তিরমিযী (হাদীস নং ২১৪০, ২৫১৮)।
৫. আবু দাউদ (হাদীস নং ৪৮৩৩)।
৬. মুসনাদ আহমাদ (হাদীস নং ২৩৯৫৮)।
৭. "আল-ফাওয়ায়েদ" – ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)।
৮. "মাদারিজুস সালিকীন" – ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)।
৯. "Elijah: Prophet of Fire" – F.B. Meyer.
১০. "Purification of the Heart" – Hamza Yusuf (আধুনিক আত্মশুদ্ধি প্রসঙ্গে)।

পরিশিষ্ট (তুলনামূলক চিত্র)

পরিশিষ্ট-১: বাল দেবতার বিভিন্ন রূপ ও তাদের বৈশিষ্ট্য: এই সারণীটি প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত বাল দেবতার পাঁচটি প্রধান রূপের একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে। এতে বাল-হাদাদ (ঝড় ও বৃষ্টির দেবতা), বাল-জেবুব (রোগ নিরাময়ের দেবতা), বাল-পেওর (যৌন উর্বরতার দেবতা), বাল-হামোন (কার্থেজের প্রধান দেবতা ও শিশুবলির সাথে সম্পৃক্ত) এবং মেলকার্ত (টায়ারের পৃষ্ঠপোষক দেবতা)-এর নাম, উপাসনাকেন্দ্র, প্রতীক ও উপাসনার ধরন সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। সারণীটির নিচে প্রদত্ত নোটসমূহে উগারিতিক টেক্সট, বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তক, কার্থেজের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং গ্রিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনার উল্লেখ করে তথ্যগুলোর ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রমাণ করা হয়েছে। এই সারণীটি পাঠককে বুঝতে সাহায্য করে যে, ইলিয়াস (আ.)-এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো 'বাল' কোনো একক বা সাধারণ মূর্তি ছিল না; বরং তা ছিল একটি সুবিস্তৃত ধর্মীয় ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে মানুষের রিজিকের ভয় ও কুসংস্কারকে পুঁজি করে টিকে ছিল।

পরিশিষ্ট-২: পবিত্র কোরআন ও বাইবেলে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার তুলনামূলক বিবরণ: এই সারণীটি ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন ও মিশন সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনার মধ্যে একটি ধাপে ধাপে তুলনা উপস্থাপন করে। এতে নাম ও পরিচয়, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, প্রধান দাওয়াতের ভাষ্য, খরার ভবিষ্যদ্বাণী, কারমেল পর্বতের চ্যালেঞ্জ এবং জীবনের সমাপ্তি এই ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয় গ্রন্থের বক্তব্য পাশাপাশি স্থাপন করা হয়েছে। সারণীটি দেখায় যে, উভয় ধর্মগ্রন্থেই ইলিয়াস (আ.)-কে বালপূজার বিরুদ্ধে তাওহীদের প্রচারক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন ভিত্তি। তবে তাঁর জীবনের সমাপ্তি নিয়ে বাইবেলের 'অগ্নিরথে উর্ধ্বগমন'-এর বর্ণনা এবং ইসলামী আকীদায় নবীদের স্বাভাবিক মৃত্যুর বিশ্বাসের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সারণীটির নোটে ইসলামী পন্ডিতদের 'ইসরাইলিয়াত' সম্পর্কিত মূলনীতি এবং বাইবেলের বর্ণনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতার বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৩: প্রাচীন বালপূজা ও আধুনিক 'বাল'-এর তুলনামূলক রূপ: এই সারণীটি বইয়ের মূল বক্তব্য যে আধুনিক যুগেও মানুষ অজান্তে 'বাল'-এর পূজা করে চলেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ও দৃশ্যমান সারসংক্ষেপ। এতে উপাসনার কেন্দ্রবস্তু, প্রধান ভয়, উপাসনার আচার-অনুষ্ঠান, 'পুরোহিত' শ্রেণি, 'শিশুবলি'-র রূপ এবং পরিণতি এই ছয়টি মাপকাঠিতে প্রাচীন কানানীয় বালপূজা এবং একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক 'বাল' পূজার (যেমন চাকরি, অর্থ, সামাজিক স্বীকৃতি) মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। সারণীটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, বাহ্যিক রূপ বদলালেও মানুষের অন্তর্নিহিত ভয় (রিজিকের অনিশ্চয়তা) এবং সেই ভয় থেকে উদ্ভূত আচরণ (নিজের ও সন্তানের নৈতিকতা বিসর্জন) মৌলিকভাবে একই রয়ে গেছে। নোটে কোরআনের প্রাসঙ্গিক আয়াত ও আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার উল্লেখ করে এই তুলনার ভিত্তি সুদৃঢ় করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৪: ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জি: এই সারণীটি ইলিয়াস (আ.)-এর সমগ্র নবুয়তী জীবনের একটি কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জি উপস্থাপন করে। রাজা আহাবের কাছে খরার ভবিষ্যদ্বাণী থেকে শুরু করে আল-ইয়াসা (আ.)-কে উত্তরাধিকার প্রদান পর্যন্ত মোট ষোলটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এখানে ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে। প্রতিটি ঘটনার জন্য আনুমানিক সময়কাল, স্থান, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, ফলাফল বা শিক্ষা এবং প্রধান উৎস উল্লেখ করা হয়েছে। এই সারণীটি পাঠকের জন্য একটি দ্রুত রেফারেন্স গাইড হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে তিনি ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের বিভিন্ন পর্বের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতা সহজেই উপলব্ধি করতে পারেন। নোটে সময়কাল নির্ধারণের ঐতিহাসিক ভিত্তি এবং ইসলামী তাফসীরের সাথে বাইবেলীয় বর্ণনার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৫: তাওয়াক্কুল বনাম তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা: এই সারণীটি বইয়ের পঞ্চম পর্বের মূল শিক্ষা 'কারমেলের পানি ঢালা মনোভাব' বা আল্লাহর ওপর চূড়ান্ত ভরসা এর একটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। এতে সংজ্ঞা, মাধ্যমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, ফলাফলের প্রতিক্রিয়া, অন্তরের অবস্থা, হারাম উপার্জনের প্রতি মনোভাব এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি এই ছয়টি মাপকাঠিতে 'তাওয়াক্কুল' (আল্লাহর ওপর প্রকৃত ভরসা) এবং 'তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা' (দুনিয়ার মাধ্যমের ওপর ভরসা)-এর মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন থেকে একটি দৃষ্টান্ত এবং কোরআন-হাদীসের একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে। সারণীটির নোটে ইমাম গাজ্জালী ও ইবনুল কাইয়্যিমের মতো ইসলামী পন্ডিতদের তাওয়াক্কুল-সংক্রান্ত ব্যাখ্যা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উল্লেখ করে বিষয়টির গভীরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-৬: কানানীয় প্যান্থিয়ন বনাম ইসলামী তাওহীদের ধারণা: এই শেষ সারণীটি প্রাচীন কানানীয় বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাস এবং ইসলামের একেশ্বরবাদী তাওহীদ দর্শনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো একটি স্পষ্ট কাঠামোয় উপস্থাপন করে। এতে ঈশ্বরের সংখ্যা ও প্রকৃতি, সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক, ইবাদতের মাধ্যম ও পদ্ধতি, উপাসনার উদ্দেশ্য এবং মানুষের অবস্থান এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ে দুই

ধর্মবিশ্বাসের বৈপরীত্য তুলে ধরা হয়েছে। সারণীটি স্পষ্ট করে যে, কানানীয় ধর্মে দেবতারা সীমিত ক্ষমতার অধিকারী, সৃষ্টির অংশ এবং মানুষের কাছ থেকে চরম ত্যাগ দাবি করে (যেমন শিশুবলি)। অন্যদিকে ইসলামী তাওহীদে আল্লাহ একক, অদ্বিতীয়, সর্বশক্তিমান, সৃষ্টির উর্ধ্বে এবং মানুষকে সম্মানিত করে তাঁর খলিফা হিসেবে নিয়োগ করেছেন। ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াত ছিল এই মৌলিক পার্থক্যটিকে ইসরাইলিদের সামনে স্পষ্ট করে তোলা এবং তাদের কানানীয় ধর্মের অন্ধকার থেকে বের করে এনে তাওহীদের আলোয় ফিরিয়ে আনা। নোটে উগারিতিক টেক্সট ও কোরআনের আয়াতসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তুলনার প্রামাণ্য ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-১: বাল দেবতার বিভিন্ন রূপ ও তাদের বৈশিষ্ট্য

রূপের নাম	অর্থ/পরিচয়	উপাসনার কেন্দ্রস্থল	প্রধান বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক	উপাসনার ধরন	উল্লেখিত উৎস
বাল-হাদাদ (Ba'al Hadad)	ঝড়, বজ্র ও বৃষ্টির দেবতা; বালের প্রধান ও প্রাচীনতম রূপ	উগারিত, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া	ষাঁড়ের শিং, বজ্রপাতের অস্ত্র, 'মেঘের আরোহী' উপাধি	কৃষি উৎসব, পশুবলি, উর্বরতার আচার	উগারিতিক টেক্সট (রাস শামরা ফলক), বাইবেল
বাল-জেবুব (Ba'al Zebub)	'মাছির প্রভু'; রোগ নিরাময় ও মহামারী নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা	ইক্রোণ (ফিলিস্তিন)	মাছি বা পতঙ্গের সাথে সম্পৃক্ততা	রোগ নিরাময়ের প্রার্থনা, ভবিষ্যদ্বাণী জিজ্ঞাসা	২ রাজাবলি ১:২-১৬; নিউ টেস্টামেন্ট (বিলজিবাব রূপে)
বাল-পেওর (Ba'al Peor)	মোয়াবের পেওর পর্বতের অধিষ্ঠাতা দেবতা	মোয়াব (জর্ডানের পূর্বাঞ্চল)	যৌন উর্বরতা, লজ্জাহীনতা	প্রকাশ্য ব্যভিচার, উর্বরতা বৃদ্ধির নামে যৌন আচার-অনুষ্ঠান	গণনা পুস্তক ২৫:১-৯; দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩
বাল-হামোন (Ba'al Hammon)	কার্থেজীয় সভ্যতার প্রধান দেবতা; উর্বরতা ও সূর্যের দেবতা	কার্থেজ (উত্তর আফ্রিকা)	সিংহাসনে উপবিষ্ট বয়স্ক পুরুষ, মেষের শিং	শিশুবলি (টোফেট), অগ্নিবলি	কার্থেজীয় শিলালিপি; দিওদোরাস সিকুলাস-এর বর্ণনা
মেলকার্ত (Melqart)	'নগরীর রাজা'; ফিনিশীয়দের (বিশেষ করে টায়ার নগরীর) প্রধান দেবতা	টায়ার (লেবানন)	সিংহের চামড়া পরিহিত, গদা হস্তে	বাণিজ্য সুরক্ষা, সমুদ্রযাত্রার আগে প্রার্থনা	ফিনিশীয় মুদ্রা ও শিলালিপি; হেরোডোটাস-এর বর্ণনা

সারণী-১ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **উগারিতিক টেক্সট:** ১৯২৮ সালে সিরিয়ার রাস শামরায় আবিষ্কৃত মাটির ফলকগুলোতে বাল-হাদাদের পৌরাণিক কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এই ফলকগুলোতে বালকে 'জেবুল বাল' (উচ্চ প্রভু বাল) এবং 'মেঘের আরোহী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। (উৎস: John Gray, "The Canaanites"; Peter C. Craigie, "Ugaritic Texts and the Bible")

২. **বাল-জেবুব:** বাইবেলের ২ রাজাবলি ১ অধ্যায়ে ইসরাইলের রাজা আহসিয়া ইক্রোণের এই দেবতার মন্দিরে দূত পাঠানোর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী ইহুদি ও খ্রিস্টান ঐতিহ্যে এটি শয়তানের নামে পরিণত হয় (বিলজিবাব/বিলজিবুল)। (উৎস: The Oxford Companion to the Bible)

৩. **বাল-পেওর:** তাওরাতে বর্ণিত, বনী ইসরাইল শিটিম উপত্যকায় মোয়াবীয় নারীদের প্ররোচনায় এই দেবতার পূজায় লিপ্ত হয়েছিল, যার ফলে আল্লাহর ক্রোধে ২৪,০০০ লোক মারা যায়। (উৎস: গণনা পুস্তক ২৫)

৪. **বাল-হামোন ও শিশুবলি:** কার্থেজের টোফেট নামক কবরস্থান থেকে হাজার হাজার পোড়া শিশুর অস্থি পাওয়া গেছে, যা এই দেবতার উদ্দেশ্যে শিশুবলির প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। গ্রিক ইতিহাসবিদ দিওদোরাস সিকুলাস ও প্লুতার্ক এই বলিদানের ভয়াবহ বিবরণ দিয়েছেন। (উৎস: Serge Lancel, "Carthage: A History"; Diodorus Siculus, "Library of History", Book ২০)

৫. **মেলকার্ত:** ফিনিশীয়দের এই দেবতা গ্রিক পুরাণের হেরাক্লিসের সাথে তুলনীয়। টায়ার নগরী ছিল এর প্রধান উপাসনাকেন্দ্র। (উৎস: Carolina Lôpez-Ruiz, "Phoenicians and the Making of the Mediterranean")

পরিশিষ্ট-২: পবিত্র কোরআন ও বাইবেলে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনার তুলনামূলক বিবরণ

ঘটনা/বিষয়	পবিত্র কোরআনের বিবরণ	বাইবেলের বিবরণ (১ রাজাবলি ও ২ রাজাবলি)	সাদৃশ্য/পার্থক্য ও মন্তব্য
নাম ও পরিচয়	ইলিয়াস (إلياس) অথবা ইল-ইয়াসীন (إل ياسين)। প্রেরিত রাসূলদের একজন এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা সাফফাত ১২৩-১৩২; সূরা আনআম ৮৫)	Elijah the Tishbite of Gilead (গিলিয়দের তিশবীবাসী ইলিয়াস)। ঈশ্বরের নবী। (১ রাজাবলি ১৭:১)	উভয় স্থানেই নবী হিসেবে স্বীকৃত। নামের উচ্চারণে সামান্য পার্থক্য। কোরআনে বংশপরিচয় সংক্ষিপ্ত।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	বালবেক নগরীতে বাসকারী বনী ইসরাইলের একটি অংশ, যারা 'বাল' মূর্তির পূজা করত। (তাফসীর ইবনে কাসির)	রাজা আহাব ও রানি ইজেবেলের শাসনামলে উত্তর ইসরাইল রাজ্যে বালপূজা রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়। (১ রাজাবলি ১৬:২৯-৩৩)	উভয় বর্ণনায় বালপূজার বিস্তৃতি ও নবীর দাওয়াতের প্রেক্ষাপট মিলে যায়। কোরআনে রাজা-রানির নাম উল্লেখ নেই।
প্রধান দাওয়াত	"তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?" (সূরা সাফফাত ১২৫)	"তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে চলবে? যদি সদাপ্রভুই ঈশ্বর হন, তবে তাঁর অনুসরণ করো।" (১ রাজাবলি ১৮:২১)	উভয় ক্ষেত্রেই মূল বক্তব্য তাওহীদ ও শিরক পরিত্যাগের আহ্বান। কোরআনে সরাসরি বালের নাম উল্লেখ, বাইবেলে বর্ণনামূলক।
খরার ভবিষ্যদ্বাণী	সরাসরি উল্লেখ নেই কোরআনে, তবে তাফসীরে বর্ণিত আছে।	"আগামী বছরগুলোতে শিশির বা বৃষ্টি কিছুই পড়বে না, শুধু আমার কথাতেই পড়বে।" (১ রাজাবলি ১৭:১)	তাফসীর গ্রন্থে বাইবেলের এই অংশটি উদ্ধৃত হয়েছে এবং ইসলামী ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়।
কারমেল পর্বতের চ্যালেঞ্জ	সরাসরি উল্লেখ নেই, তবে সূরা সাফফাতের আয়াতে বালের অসারতা প্রমাণের বিষয়টি অন্তর্নিহিত।	৪৫০ জন বালের পুরোহিতের সাথে ইলিয়াসের প্রতিযোগিতা এবং আসমান থেকে আগুন নেমে আসার বিস্তারিত বিবরণ। (১ রাজাবলি ১৮:২০-৪০)	ইসলামী তাফসীরে এই ঘটনাটি ইলিয়াস (আ.)-এর অন্যতম বড় মুজিজা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। (তাফসীর ইবনে কাসির)
জীবনের সমাপ্তি	কোরআনে মৃত্যুর কোনো বিবরণ নেই; আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সালাম ও সুনাম রেখে দিয়েছেন। (সূরা সাফফাত ১২৯-১৩০)	অগ্নিরথ ও অগ্নিময় ঘোড়ায় চড়ে ঘূর্ণিবায়ুতে আসমানে উত্থিত হওয়ার বিবরণ। (২ রাজাবলি ২:১১)	ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, নবীগণ স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। বাইবেলের এই বর্ণনা 'ইসরাইলিয়াত' হিসেবে গণ্য, যা বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

সারণী-২ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **কোরআনের আয়াতসমূহ:** সূরা আস-সাফফাত (১২৩-১৩২), সূরা আল-আনআম (৮৫)। এই আয়াতগুলোতে ইলিয়াস (আ.)-এর মর্যাদা ও তাঁর দাওয়াতের সারসংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে।

২. **তাফসীর গ্রন্থ:** ইমাম ইবনে কাসির (রহ.)-এর 'কাসাসুল আম্বিয়া' এবং তাফসীরে ইবনে কাসির-এ ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনায় বাইবেলের অনেকাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে এবং তা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. **বাইবেলের পুস্তক:** ১ রাজাবলি (অধ্যায় ১৭, ১৮, ১৯, ২১) এবং ২ রাজাবলি (অধ্যায় ১, ২)। এই পুস্তকগুলোতে ইলিয়াসের জীবন ও মিশনের বিস্তারিত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়।

৪. **ইসরাইলিয়াত সম্পর্কে সতর্কতা:** ইসলামী পন্ডিতগণ বাইবেলের বর্ণনাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন (ক) যা কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তা গ্রহণযোগ্য; (খ) যা সাংঘর্ষিক, তা প্রত্যাখ্যাত; (গ) যা সম্পর্কে নিশ্চিত তথ্য নেই, সে বিষয়ে নীরব থাকা কর্তব্য। ইলিয়াস (আ.)-এর অগ্নিরথে উর্ধ্বগমনের ঘটনা তৃতীয় বিভাগে পড়ে।

৫. **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:** উভয় ধর্মগ্রন্থেই ইলিয়াস (আ.)-কে বালপূজার বিরুদ্ধে তাওহীদের প্রচারক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা দুটি ধর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিন্ন ভিত্তি।

পরিশিষ্ট-৩: প্রাচীন বালপূজা ও আধুনিক 'বাল'-এর তুলনামূলক রূপ

তুলনার বিষয়	প্রাচীন বালপূজা (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৮০০ অব্দ)	আধুনিক 'বাল' (একবিংশ শতাব্দী)	অন্তর্নিহিত সাদৃশ্য ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা
উপাসনার কেন্দ্রবস্তু	পাথর বা ধাতুর তৈরি মূর্তি (বাল-হাদাদ, আশেরা ইত্যাদি)	চাকরি, ব্যাংক ব্যালেন্স, সামাজিক স্বীকৃতি, ডিগ্রি, ক্ষমতা	উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার রিজিক, নিরাপত্তা ও সম্মানের উৎস হিসেবে আল্লাহর পরিবর্তে দৃশ্যমান কোনো মাধ্যমকে নির্ভর করে।
প্রধান ভয়	বৃষ্টি না হলে ফসল হবে না, খরা আসবে, পরিবার না খেয়ে মারা যাবে।	চাকরি হারালে সংসার চলবে না, ব্যাংক ব্যালেন্স কমে গেলে নিরাপত্তাহীনতা আসবে, সামাজিকভাবে অসম্মানিত হব।	উভয় ক্ষেত্রেই মূল চালিকাশক্তি 'রিজিকের ভয়' এবং 'ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা'। কোরআনের ভাষায় "শয়তান তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় দেখায়।" (সূরা বাকারা: ২৬৮)
উপাসনার আচার-অনুষ্ঠান	মূর্তির সামনে নৃত্য, চিৎকার, নিজের শরীর কেটে রক্তপাত, পশুবলি, শিশুবলি।	অতিরিক্ত পরিশ্রম করে শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য বিসর্জন, হারাম উপার্জনের জন্য নৈতিকতা বিসর্জন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রদর্শনেচ্ছা।	উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ তার 'দেবতাকে' সন্তুষ্ট করতে নিজের কোনো না কোনো মূল্যবান বস্তু (স্বাস্থ্য, নৈতিকতা, সময়, পরিবার) উৎসর্গ করে।
'পুরোহিত' শ্রেণি	বালের মন্দিরের পুরোহিতরা, যারা মানুষকে মূর্তিপূজায় প্ররোচিত করত এবং ভয় দেখিয়ে ধর্মীয় আচার বজায় রাখত।	কর্পোরেট বস, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, বিজ্ঞাপন সংস্থা, কিছু ক্ষেত্রে পরিবার বা সমাজের চাপ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিরা।	উভয় ক্ষেত্রেই একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সাধারণ মানুষের মনে এই বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেয় যে, তাদের নির্ধারিত পথ ছাড়া সফলতা বা সুখ সম্ভব নয়।
'শিশুবলি'-র রূপ	বালের মূর্তির সামনে জ্বলন্ত আগুনে নিজেদের জীবন্ত সন্তানদের নিক্ষেপ করা।	ক্যারিয়ারের জন্য সন্তানের শৈশব, নৈতিকতা ও দ্বীনি শিক্ষা বিসর্জন দেওয়া; হারাম উপার্জনের টাকায় সন্তানের ভরণপোষণ।	উভয় ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা 'উন্নত ভবিষ্যতের' নামে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ তা দৈহিক হোক বা আধ্যাত্মিক ধ্বংস করছে। পার্থক্য শুধু পদ্ধতিতে।
পরিণতি	খরা, দুর্ভিক্ষ, জাতীয় বিপর্যয়, ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়া (যেমন ইজেবেলের পরিণতি)।	মানসিক অশান্তি, পারিবারিক ভাঙন, আধ্যাত্মিক শূন্যতা, আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।	কোরআনের ঘোষণা: "আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য সংকীর্ণ জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হবে।" (সূরা ত্বহা: ১২৪)

সারণী-৩ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **প্রাচীন বালপূজার বিবরণ:** উগারিতিক টেক্সট, বাইবেলের রাজাবলি পুস্তক, কার্থেজের টোফেট খননকার্যের প্রতিবেদন এবং গ্রিক ইতিহাসবিদ দিওদোরাস সিকুলাস ও প্লুতার্কের বর্ণনা থেকে সংকলিত।

২. **আধুনিক 'বাল'-এর ধারণা:** এটি বইয়ের পঞ্চম পর্বে বিস্তারিত আলোচিত একটি বিশ্লেষণধর্মী ধারণা। এর ভিত্তি হলো কোরআনের শিরক ও রিজিক সম্পর্কিত আয়াতসমূহ এবং আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা। (উৎস: Max Weber-এর "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism"; Barry Schwartz-এর "The Paradox of Choice")

৩. **মনস্তাত্ত্বিক সাদৃশ্য:** উভয় যুগের মানুষের মধ্যেই 'অস্তিত্বের নিরাপত্তাহীনতা' (Existential Insecurity) এবং 'নিয়ন্ত্রণ

হারানোর ভয়' (Fear of Losing Control) কাজ করে, যা তাদেরকে দৃশ্যমান ও স্পর্শযোগ্য মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ইসলামী দৃষ্টিকোণে এর সমাধান 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর অগাধ ভরসা।

৪. **কোরআনের সতর্কবার্তা:** "বলো, 'আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব, যারা কর্মে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই, যাদের পার্থিব জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, অথচ তারা মনে করে তারা ভালো কাজ করছে।'" (সূরা কাহফ: ১০৩-১০৪)।

পরিশিষ্ট-৪: ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের প্রধান ঘটনাপঞ্জি (কালানুক্রমিক)

ক্রমিক	ঘটনা	আনুমানিক সময়কাল	স্থান	সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/পক্ষ	ফলাফল/শিক্ষা	প্রধান উৎস
১	ইলিয়াস (আ.)-এর আকস্মিক আবির্ভাব ও রাজা আহাবের কাছে খরার ভবিষ্যদ্বাণী	খ্রিস্টপূর্ব আনু. ৮৭০	শমরিয়া (রাজপ্রাসাদ)	রাজা আহাব	রাষ্ট্রীয় বালপূজার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ; আল্লাহর ক্ষমতার ঘোষণা	১ রাজাবলি ১৭:১
২	কেরীৎ উপত্যকায় আত্মগোপন ও কাকের মাধ্যমে অলৌকিক রিজিক প্রাপ্তি	খরার প্রথম পর্যায়	কেরীৎ উপত্যকা (জর্ডানের পূর্বে)		আল্লাহ চাইলে অসম্ভব মাধ্যমেও রিজিক দিতে পারেন	১ রাজাবলি ১৭:২-৬
৩	সারিফতের বিধবার ঘরে আশ্রয়; আটা ও তেলের অলৌকিক বরকত	খরার মধ্যম পর্যায়	সারিফত (সীদোনের নিকট)	এক ইসরাইলি বিধবা ও তার পুত্র	তাওয়াক্কুলের পুরস্কার; নবীর মুজিজায় বিশ্বাসের গুরুত্ব	১ রাজাবলি ১৭:৮-১৬
৪	বিধবার মৃত পুত্রকে জীবিত করা	খরার মধ্যম পর্যায়	সারিফত	ইসরাইলি বিধবা	মৃত্যু ও জীবনের মালিক একমাত্র আল্লাহ; নবীর দোয়ার ক্ষমতা	১ রাজাবলি ১৭:১৭-২৪
৫	ওবদিয়ার সাথে সাক্ষাৎ ও রাজা আহাবের সামনে পুনরায় উপস্থিতি	খরার তৃতীয় বছরের শেষে	শমরিয়ার পথে	ওবদিয়া, রাজা আহাব	আল্লাহর নির্দেশে সত্য প্রচারে নির্ভীকতা	১ রাজাবলি ১৮:১-১৬
৬	কারমেল পর্বতে ৪৫০ জন বালের পুরোহিতকে চ্যালেঞ্জ	খরার তৃতীয় বছরের শেষে	কারমেল পর্বত	বালের পুরোহিত (৪৫০), ইসরাইলের জনতা	বালের অসারতা প্রমাণ; তাওহীদের বিজয়	১ রাজাবলি ১৮:২০-৪০
৭	আসমান থেকে আগুন নেমে কুরবানি ভস্ম করা	কারমেলের চ্যালেঞ্জের দিন	কারমেল পর্বত	ইসরাইলের জনতা	আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ; জনতার আকীদা পরিবর্তন	১ রাজাবলি ১৮:৩৬-৩৯
৮	বালের পুরোহিতদের হত্যা	কারমেলের বিজয়ের পর	কিশোন নদীর তীর	ইলিয়াস (আ.), জনতা	মিথ্যার প্রচারকদের নির্মূল; আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন	১ রাজাবলি ১৮:৪০

৯	বৃষ্টির জন্য দোয়া ও সাতবার দূত প্রেরণ	কারমেলের ঘটনার পরদিন	কারমেল পর্বত	ইলিয়াসের সেবক	দোয়ায় ধৈর্য ও আল্লাহর রহমতের অপেক্ষার শিক্ষা	১ রাজাবলি ১৮:৪১-৪৪
১০	সাড়ে তিন বছরের খরার অবসান ও মুষলধারে বৃষ্টি	খরার অবসান	সমগ্র উত্তর ইসরাইল		আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার নিদর্শন	১ রাজাবলি ১৮:৪৫
১১	ইজেবেলের হুমকি ও ইলিয়াসের হতাশাগ্রস্ত হয়ে পলায়ন	বৃষ্টির পর	যিশ্রিয়েল থেকে বেরশেবা	ইজেবেল	নবীগণও মানুষ; কখনো ভয় ও ক্লান্তি আসতে পারে	১ রাজাবলি ১৯:১-৪
১২	মরুভূমিতে ফেরেশতার মাধ্যমে খাবার প্রাপ্তি ও চল্লিশ দিনের সফর	পলায়নের পর	পারান মরুভূমি, হোরেব পর্বত	ফেরেশতা	আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কখনো একা ছেড়ে দেন না	১ রাজাবলি ১৯:৫-৮
১৩	হোরেব পর্বতে আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও মৃদু শব্দে আল্লাহর উপস্থিতি	পলায়নের শেষে	হোরেব পর্বত (সিনাই)		আল্লাহ কখনো ঝড়-ভূমিকম্পে নয়, মৃদু শব্দেও কথা বলেন	১ রাজাবলি ১৯:৯-১৪
১৪	আল-ইয়াসা (আ.)-কে স্থলাভিষিক্ত নবী হিসেবে অভিষিক্তকরণ	হোরেব থেকে ফেরার পথে	আবেল-মহোলা	আল-ইয়াসা (ইলিশা)	দাওয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও উত্তরসূরি নির্বাচনের গুরুত্ব	১ রাজাবলি ১৯:১৯-২১
১৫	ইজেবেলের ভয়াবহ মৃত্যু (ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা)	ইলিয়াসের বিদায়ের কয়েক বছর পর	যিশ্রিয়েল	যেহু, ইজেবেল	অহংকারী ও সত্যবিদ্বেষীদের পরিণতি ভয়াবহ	২ রাজাবলি ৯:৩০-৩৭
১৬	ইলিয়াস (আ.)-এর বিদায় ও আল-ইয়াসা (আ.)-এর উত্তরাধিকার গ্রহণ	ইলিয়াসের জীবনের শেষ দিন	জর্ডান নদীর তীর	আল-ইয়াসা (ইলিশা)	নবুয়তের ধারাবাহিকতা; মিশনের পূর্ণতা	২ রাজাবলি ২:১-১৫

সারণী-৪ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **সময়কাল:** খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৮৭৪-৮৫৩ অব্দ রাজা আহাবের রাজত্বকাল। ইলিয়াস (আ.)-এর মিশন এই সময়েই সংঘটিত হয়েছিল। (উৎস: John Bright, "A History of Israel")

২. **বাইবেলীয় উৎস:** ১ রাজাবলি (অধ্যায় ১৭-১৯, ২১) এবং ২ রাজাবলি (অধ্যায় ১-২, ৯)। এই পুস্তকগুলো ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের সবচেয়ে বিস্তারিত ঐতিহাসিক নথি।

৩. **ইসলামী তাফসীর:** ইমাম ইবনে কাসির (রহ.)-এর 'কাসাসুল আম্বিয়া' গ্রন্থে ইলিয়াস (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং বাইবেলের এই ঘটনাগুলোকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোরআনে সরাসরি এই ঘটনাপঞ্জি না থাকলেও, তাফসীরকারগণ এগুলোকে প্রাসঙ্গিক ইতিহাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৪. **ভৌগোলিক অবস্থান:** কেরীৎ উপত্যকা, সারিফত, কারমেল পর্বত, শমরিয়া, যিশ্রিয়েল, হোরেব পর্বত এসব স্থানের বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত করা হয়েছে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক ভূগোলের ভিত্তিতে। (উৎস: Victor H. Matthews, "Manners and Customs in the Bible")

৫. **বিঃ দ্রঃ:** এই সারণীতে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে কিছু ঘটনা সরাসরি কোরআনে উল্লেখ নেই। এগুলো মূলত বাইবেল ও ইসলামী ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে সংকলিত। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, নবীগণের মর্যাদা রক্ষা করে এবং কোরআনের মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন ঘটনাগুলো আমরা ঐতিহাসিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

পরিশিষ্ট-৫: তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর ভরসা) বনাম তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা

তুলনার বিষয়	তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর প্রকৃত ভরসা)	তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা (দুনিয়ার মাধ্যমের ওপর ভরসা)	ইলিয়াস (আ.)-এর জীবন থেকে উদাহরণ	কোরআন ও হাদীসের আলোকে শিক্ষা
সংজ্ঞা	সর্বোচ্চ চেষ্টা করার পর ফলাফলের জন্য সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর নির্ভর করা।	নিজের চেষ্টা, পরিকল্পনা ও মাধ্যমকেই সফলতার একমাত্র কারণ মনে করা এবং আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব না করা।	ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতে বেদী তৈরি করেছিলেন (চেষ্টা), কিন্তু তারপর পানি ঢেলে দিয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করেছিলেন (তাওয়াক্কুল)।	"আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।" (সূরা তালাক: ৩)
মাধ্যমের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি	মাধ্যমকে আল্লাহর রহমতের একটি উপায় হিসেবে দেখা; মাধ্যম ব্যর্থ হলে হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে বিকল্প প্রার্থনা করা।	মাধ্যমকেই সবকিছু মনে করা; মাধ্যম ব্যর্থ হলে হতাশা, দুশ্চিন্তা ও আল্লাহর প্রতি অভিযোগ করা।	কেরীৎ নদী শুকিয়ে গেলে ইলিয়াস (আ.) হতাশ হননি; তিনি আল্লাহর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করেছিলেন এবং সারিফতে গিয়েছিলেন।	রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "পাখি সকালে খালি পেটে বের হয় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে ফিরে আসে।" (তিরমিযী: ২৩৪৪)
ফলাফলের প্রতিক্রিয়া	সফলতা এলে আল্লাহর শোকর আদায় করা; ব্যর্থতা এলে ধৈর্য ধরা এবং আল্লাহর কাছে তাওবা ও দোয়া করা।	সফলতা এলে অহংকার করা ও নিজের কৃতিত্ব মনে করা; ব্যর্থতা এলে হতাশায় ভেঙে পড়া এবং আল্লাহর প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া।	সারিফতের বিধবার পুত্র মারা গেলে ইলিয়াস (আ.) ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ তাকে জীবিত করেছিলেন।	"তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।" (সূরা বাকারা: ১৫৩)
অন্তরের অবস্থা	প্রশান্তি, স্থিরতা, আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশায় আনন্দ।	অস্থিরতা, উদ্বেগ, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা, হতাশা।	ইলিয়াস (আ.) যখন সপ্তমবার দূত পাঠিয়ে ছোট্ট মেঘ দেখলেন, তখন তিনি আল্লাহর রহমতের নিশ্চিত প্রত্যাশায় আনন্দিত হলেন।	"জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা রাদ: ২৮)
হারাম উপার্জনের প্রতি মনোভাব	রিজিকের ভয়ে কখনো হারাম উপার্জনকে বৈধ মনে না করা; বরং বিশ্বাস করা, হালাল পথে চেষ্টা করলে আল্লাহ বরকত দেবেন।	রিজিকের ভয়ে হারাম উপার্জনকে যুক্তিযুক্ত মনে করা এবং মনে করা, "হালাল পথে চললে সংসার চলবে না।"	ইলিয়াস (আ.) কাকের আনা খাবার খেয়েছেন, বিধবার হাতের রুটি খেয়েছেন কখনো হারাম বা সন্দেহজনক খাবার খাননি।	"হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিজিক দিয়েছি, তা থেকে আহার করো।" (সূরা বাকারা: ১৭২)
সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি	সন্তানের জন্য সর্বোত্তম চেষ্টা করা, কিন্তু তার ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে সোপর্দ	সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করা; দুনিয়ার সাফল্যের জন্য তার দ্বীনি শিক্ষা ও	ইলিয়াস (আ.) আল-ইয়াসা (আ.)-কে তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, তার মধ্যে	হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর দোয়া: "হে আমাদের রব, আমি আমার বংশধরদের কিছু অংশকে তোমার পবিত্র

	করা; সন্তানের দ্বীনি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।	নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া।	দ্বীনের জ্ঞান ও আল্লাহর ভরসার বীজ রোপণ করেছিলেন।	গৃহের কাছে বসতি স্থাপন করালাম, যাতে তারা সালাত কায়েম করে।" (সূরা ইব্রাহিম: ৩৭)

সারণী-৫ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **তাওয়াক্কুলের সংজ্ঞা:** ইসলামী পন্ডিতগণ তাওয়াক্কুলকে 'আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং মাধ্যমকে আল্লাহর ইচ্ছাধীন মনে করা' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইমাম গাজ্জালী (রহ.) 'ইহইয়া উলুমিদ্দীন'-এ তাওয়াক্কুলের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন। (উৎস: Abu Hamid al-Ghazali, "Ihya Ulum al-Din", Kitab al-Tawakkul)

২. **ইবনুল কাইয়্যিমের বিশ্লেষণ:** ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'মাদারিজুস সালিকীন' গ্রন্থে তাওয়াক্কুলকে 'অন্তরের অর্ধেক দ্বীন' বলে অভিহিত করেছেন এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৩. **আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক:** 'তাওয়াক্কুলহীন প্রচেষ্টা' আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'নিয়ন্ত্রণ বিভ্রম' (Illusion of Control) এবং 'অতিরিক্ত উদ্বেগ জনিত ব্যাধি' (Generalized Anxiety Disorder)-এর সাথে তুলনীয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন, তারা মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কম অনুভব করেন। (উৎস: Harold G. Koenig, "Religion and Mental Health: Research and Clinical Applications")

৪. **ইলিয়াস (আ.)-এর উদাহরণ:** ইলিয়াস (আ.)-এর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাওয়াক্কুলের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিশেষ করে কারমেল পর্বতে পানি ঢালার ঘটনা তাওয়াক্কুলের একটি জীবন্ত প্রতীক।

পরিশিষ্ট-৬: কানানীয় প্যান্থিয়ন বনাম ইসলামী তাওহীদের ধারণা

তুলনার বিষয়	**কানানীয় প্যান্থিয়ন (বহু-ঈশ্বরবাদী ধারণা)**	**ইসলামী তাওহীদ (একেশ্বরবাদী ধারণা)**	**পার্থক্যের তাৎপর্য ও ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াত**
ঈশ্বরের সংখ্যা ও প্রকৃতি	একাধিক দেব-দেবী (এল, বাল, আনাত, আশেরা, মোত ইত্যাদি)। প্রত্যেকের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা আছে। দেবতারা জন্মগ্রহণ করেন, লড়াই করেন, এমনকি মৃত্যুবরণও করতে পারেন (যেমন বালের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের গল্প)।	একক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ। তিনি কারো পিতা নন, কারো পুত্র নন। তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর কোনো মৃত্যু নেই, তিনি চিরঞ্জীব। (সূরা ইখলাস: ১-৪)	ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াতের মূল ভিত্তিই ছিল এই তাওহীদ। তিনি বলেছিলেন: "তোমরা কি বালকে ডাকো এবং শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাকে বর্জন করো?" বাল হলো মৃত ও সীমাবদ্ধ দেবতার প্রতীক, আর আল্লাহ হলেন চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান।
সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক	দেবতারা সৃষ্টির অংশ; তারা প্রাকৃতিক শক্তির (বৃষ্টি, ঝড়, সমুদ্র) নিয়ন্ত্রক মাত্র। কানানীয় পুরাণে দেবতারা বিশৃঙ্খলা থেকে শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন।	আল্লাহ হলেন **স্রষ্টা** (আল-খালিক), যিনি কিছুই থেকে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টির বাইরে এবং সৃষ্টির ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব রাখেন। (সূরা ফাতির: ৩)	বালকে বৃষ্টির 'মালিক' মনে করা হতো। কিন্তু ইলিয়াস (আ.) প্রমাণ করলেন, বৃষ্টি দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। বাল নিজেই আল্লাহর সৃষ্টি; সে কীভাবে সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক হতে পারে?
ইবাদতের মাধ্যম ও পদ্ধতি	মূর্তি, প্রতিমা, স্তম্ভ (আশেরা) স্থাপন; পশুবলি, শিশুবলি, যৌন আচার-অনুষ্ঠান; পুরোহিত শ্রেণির মাধ্যমে দেবতার নৈকট্য লাভের চেষ্টা।	সরাসরি আল্লাহর ইবাদত, কোনো মাধ্যম বা মূর্তি ছাড়া। ইবাদতের পদ্ধতি ওহির মাধ্যমে নির্ধারিত (সালাত, দোয়া, যিকির)।	ইলিয়াস (আ.) কারমেল পর্বতে কোনো পুরোহিত বা মূর্তির সাহায্য ছাড়াই সরাসরি আল্লাহকে ডেকেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে, আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
উপাসনার উদ্দেশ্য	প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা, ফসলের উর্বরতা, বৃষ্টি প্রাপ্তি, যুদ্ধে জয়লাভ, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি।	আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, আখেরাতের মুক্তি লাভ, আল্লাহর নৈকট্য লাভ।	কানানীয়রা বৃষ্টির জন্য বালের পূজা করত। ইলিয়াস (আ.) তাদের বুঝিয়েছিলেন, প্রকৃত রিজিকদাতা আল্লাহর ইবাদত করলে তিনি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানেই কল্যাণ দান করেন।
মানুষের অবস্থান	মানুষ দেবতাদের দাস, যাদের ভাগ্য দেবতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে মানুষকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয় (যেমন শিশুবলি)।	মানুষ আল্লাহর **খলিফা** (প্রতিনিধি) এবং **ইবাদতের জন্য সৃষ্ট** (সূরা যারিয়াত: ৫৬)। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেছেন (সূরা বনী ইসরাইল: ৭০) এবং তাঁর রহমতের দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত।	কানানীয় ধর্ম মানুষকে হেয় করেছিল তারা নিজেদের সন্তানদের আগুনে ফেলে দিত। ইসলাম মানুষকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে এবং সন্তান হত্যাকে কবিরা গুনাহ ঘোষণা করেছে। (সূরা আনআম: ১৫১)

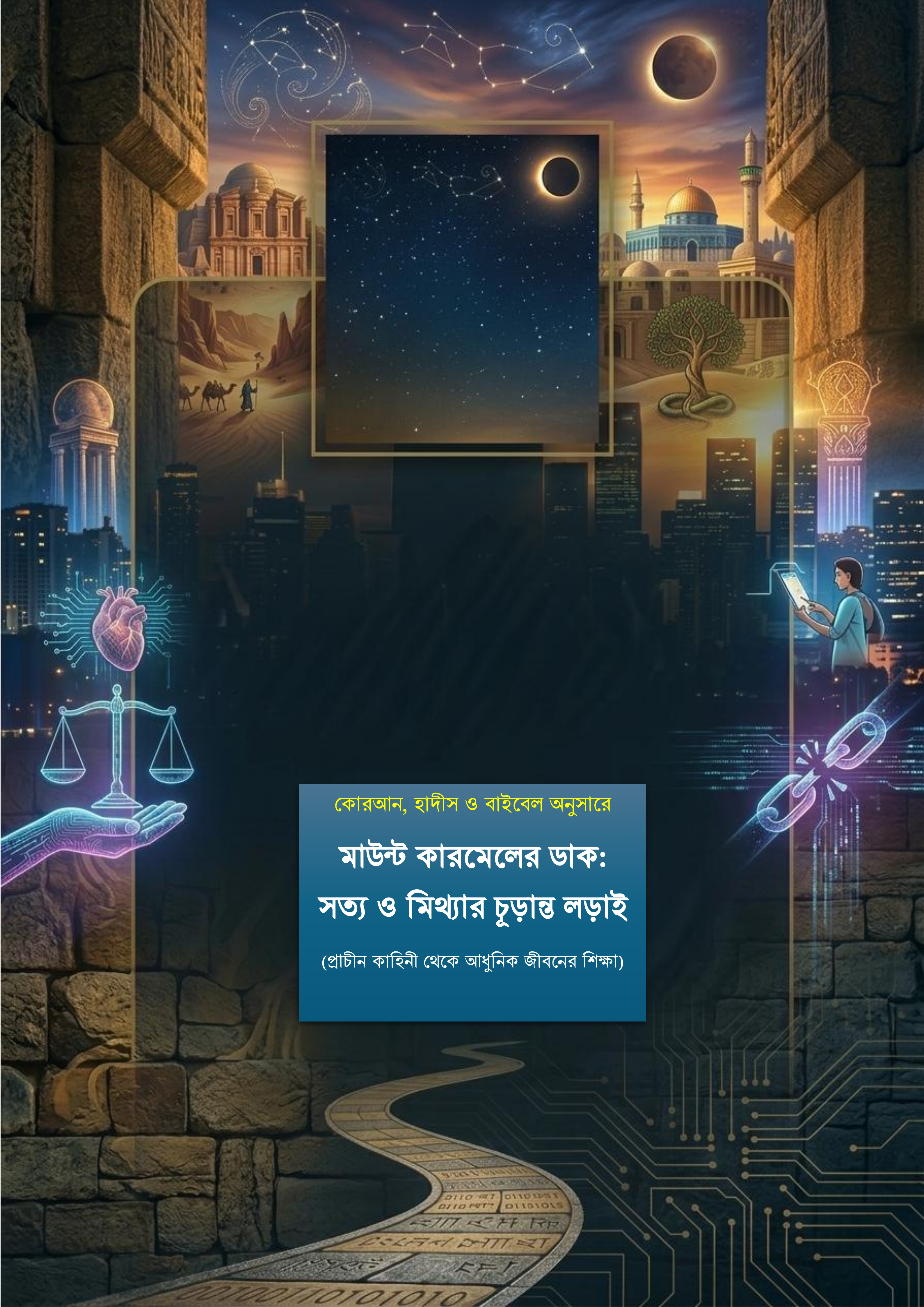
সারণী-৬ এর নোট ও তথ্যসূত্র:

১. **কানানীয় প্যান্থিয়ন সম্পর্কিত তথ্য:** উগারিতিক টেক্সট (রাস শামরা ফলক) এবং ফিনিশীয় শিলালিপি থেকে প্রাপ্ত। এই ধর্মে দেবতাদের পারিবারিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। (উৎস: John Gray, "The Canaanites"; Mark S. Smith, "The Early History of God")

২. **ইসলামী তাওহীদের ধারণা:** পবিত্র কোরআনের সূরা ইখলাস, সূরা ফাতির, সূরা বাকারা এবং অন্যান্য অসংখ্য আয়াতে আল্লাহর একত্ব ও অদ্বিতীয়তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাওহীদ ইসলামের মূল ভিত্তি এবং সকল নবীর প্রধান দাওয়াত।

৩. **ইলিয়াস (আ.)-এর দাওয়াতের প্রাসঙ্গিকতা:** ইলিয়াস (আ.)-এর সময়ে বনী ইসরাইল কানানীয় প্যান্থিয়নের প্রভাবে তাওহীদ থেকে বিচ্যুত হয়েছিল। ইলিয়াস (আ.)-এর মিশন ছিল তাদের আবার মূল তাওহীদের পথে ফিরিয়ে আনা। কোরআনের ভাষায়: "আল্লাহ্ই তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও রব।" (সূরা সাফফাত: ১২৬)

৪. **তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব:** এই সারণীটি ইসলামী তাওহীদ ও প্রাচীন সেমেটিক বহু-ঈশ্বরবাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যগুলো স্পষ্ট করে, যা পাঠককে ইলিয়াস (আ.)-এর সংগ্রামের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করবে।



কোরআন, হাদীস ও বাইবেল অনুসারে

মাউন্ট কারমেলের ডাক: সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত লড়াই

(প্রাচীন কাহিনী থেকে আধুনিক জীবনের শিক্ষা)